শনিবারের চিঠি

২৬ মাঘ ১৩৯১ □ ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

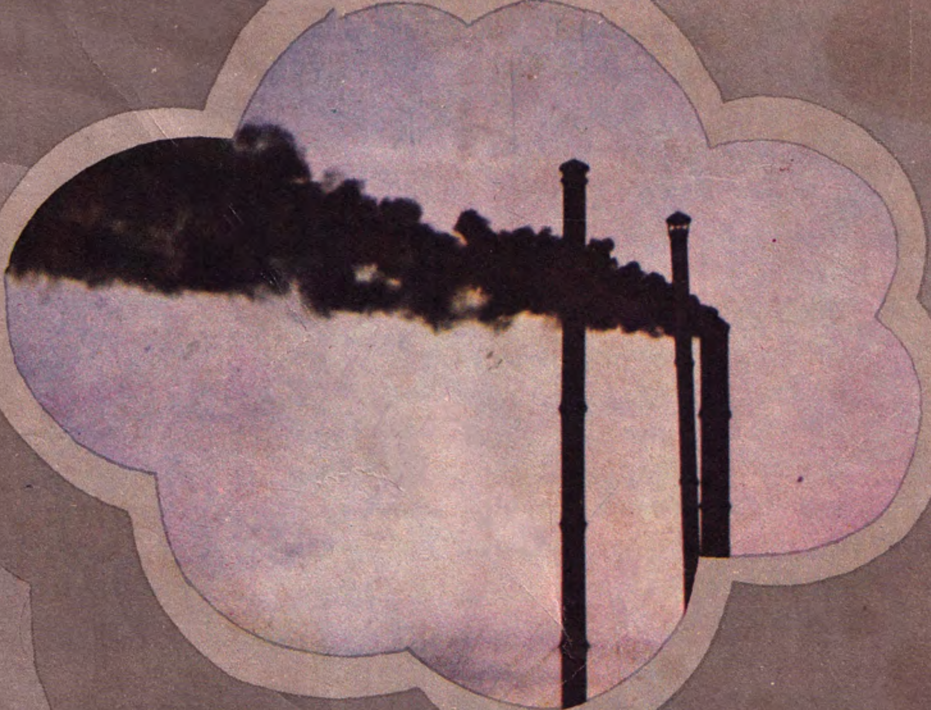

কলকাতার পরিবেশ
মাল্টিন্যাশনালদের বেআইনী
কার্যকলাপে বিপর্যস্ত

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ রূপালী গোসাভি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

আমাদের প্রকাশিত চিরায়ত গ্রন্থরাজি

* রচনাবলী – মানিক গ্রন্থাবলী (১৩ খণ্ডে সমাপ্ত) ।। বনফুল রচনাবলী (১৯ খণ্ড প্রকাশিত) ।। বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ (৯ খণ্ড প্রকাশিত) ।। অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী (১০ খণ্ড প্রকাশিত) ।। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী (৪ খণ্ড প্রকাশিত) ।। প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনাবলী (২ খণ্ড প্রকাশিত) ।। জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী (২ খণ্ড প্রকাশিত) ।।

প্রতি খণ্ডের মূল্য ৩০ টাকা। তালিকাভূক্ত গ্রাহকদের জন্য বিশেষ সুবিধা রয়েছে।

* বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবণের গবেষণা গ্রন্থ–অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত
রবীন্দ্র-রচনা সংকলন –
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা-২৫ টাকা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তা-৩০ টাকা

* রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত ।। অধ্যাপক সতেন্দ্রনাথ রায় ।। ৩০ টাকা
রবীন্দ্র স্মৃতি ।। বনফুল ।। ১০ টাকা

* অধ্যাপক ড: সরোজমোহন মিত্রের–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য ।। ৩০ টাকা
সুকান্তের জীবন ও কাব্য ।। ১৫ টাকা শরৎসাহিত্যে সমাজচেতনা ।। ১৬ টাকা

* উপন্যাস –বনফুল হাটেবাজারে ৮ টাকা ।। গোপালদেবের স্বপ্ন ১০ টাকা ।। অধিক লাল ১০ টাকা ।। ত্রিনয়ন ৮ টাকা ।। গল্পসমগ্র (দুই খণ্ড প্রকাশিত) প্রতি খণ্ড ৩০ টাকা ।। পশ্চাৎপট (আত্মজীবনী) ২৫ টাকা ।।
–বুদ্ধদেব বসু বাসর ঘর ১০ টাকা ।। লাল মেঘ ১০ টাকা ।। কালো হাওয়া ১৫ টাকা ।। এলোমেলো জলতরঙ্গ (ছোটদের উপন্যাস) ১০ টাকা ।।
–প্রতিভা বসু : জন্মান্তর ১০ টাকা ।। যখন বসন্ত ১০ টাকা ।। স্মৃতি সততই সুখের ।। (আমেরিকা ও ইউরোপপের বিচিত্র ভ্রমন কাহিনী–দুই খণ্ডে। প্রতি খণ্ড ২০ টাকা এবং ৩০ টাকা ।।
–জগদীশ গুপ্ত : লঘুগুরু ও অসাধু সিদ্ধার্থ ১০ টাকা ।।
–নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : পদসঞ্চার ১২ টাকা ।।
–শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জনপদবধূ ১২ টাকা ।। কর্ণাটরাগ ৮ টাকা ।। নগরনন্দিনীর রূপকথা ১০ টাকা ।।
–নিরঞ্জন চক্রবর্তী : খেলাঘরের যাত্রী ৮ টাকা ।। প্রতিবিম্বের স্বাদ ৮ টাকা ।।

* কবিতা –অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : উত্তরায়ণ ১০ টাকা ।। নীল আকাশ ৮ টাকা ।। পূব পশ্চিম ৮ টাকা ।। আজন্ম সুরভী ৮ টাকা ।।
–বুদ্ধদেব বসু শীতের প্রার্থনা-বসন্তের উত্তর ১০ টাকা ।। যে আঁধার আলোর অধিক ৮ টাকা ।। মরচে পড়া পেরেকের গান ৮ টাকা ।।
–জীবনানন্দ দাস : আলো পৃথিবী ১০ টাকা ।।
–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সমগ্র কবিতা ১০ টাকা ।।

গ্রন্থালয় প্রা. লি. – ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট ।। কলিকাতা-৭৩

গণতন্ত্রের লাভ ক্ষতি : ভারত ও পাকিস্তান □ অরুণ বাগচী ৩
ধর্মঘটী ইঞ্জিনিয়ারদের মাইনে কাটা গেল □ নিজস্ব প্রতিনিধি ৪
চলচ্চিত্র উৎসবে বিশৃঙ্খলার নেপথ্যে □ বিশেষ প্রতিনিধি ৫
উৎসব নিয়ে আর ছেলেখেলা নয় □ আশিসতরু মুখোপাধ্যায় ৮
পরিবেশ দূষণ : মাল্টিন্যাশানালদের কার্যকলাপ.... □ শুভাশিস মৈত্র, বিশ্বজিৎ রায়, সুমিত মিত্র, ডঃ পার্থ সেন ১০
দুর্গাপুর : জীবনের চেয়ে কি শিল্প বড়? □ উৎপল অধিকারী
সেকাল ও একালে খুচরো পয়সার আকাল □ অশোক সেনগুপ্ত ২৮
লালবাড়ি রহস্য □ ৪৭
সুভাষ মেলা – একগণ্ডা জেনারেটর □ শুভ্রা মুখোপাধ্যায় ২৯
মরজি মহল □ ৩০
রক্ত ও ভয়ের স্মৃতি ফলক □ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪
স্বামী নামক আসামী □ মেঘনাদ বর্মা ৩৭
নূপুরের মত □ অনুলিখন অনুপমা দাশ ৩৯
গল্প : প্রতিদান □ তিমিরেন্দু রায়চৌধুরী ৪৩
১২২ বছরের এক সন্যাসী □ লছমী বাগচি
সংবাদ-সাহিত্য □ ৪৮
প্রচ্ছদ □ পূণ্যব্রত পত্রী
প্রচ্ছদের ছবি □ প্রবীর দাস
অন্যান্য ছবি □ কবীর আইচ, অলক মিত্র

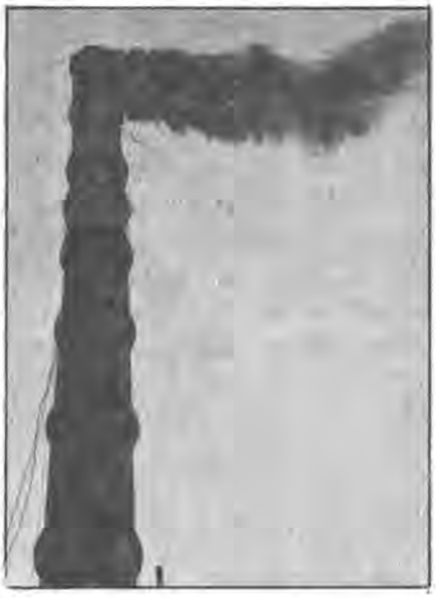

পরিবেশ নিয়ে কারোরই কোনদিন মাথাব্যাথা ছিলনা। যেহেতু বাতাসকে আমরা চোখে দেখতে পাই না। সেইহেতু সে দুষিত না পরিশ্রুত তাতে কার কি এলো গেলো? বর্তমানে নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাবে প্রত্যেককেই এখন ভাবিয়ে তুলেছে পরিবেশ সম্পর্কে। শুধু বায়ু দুষণই নয় শব্দ দুষণ, জল দুষণ সবেরই শিকার হয়েছে মানুষ। প্রত্যেকটি মানুষই আজ আতঙ্কিত। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে এক বিস্তৃত সমীক্ষা। আইনকে কলা দেখিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠছে মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানিগুলো।

আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারী

অন্নদা মুন্সির পরিচয় শুধুই ছবি আঁকিয়ে হিসাবে নয়। তাঁর জীবন ছিল বৈচিত্রে ভরা। তুলির প্রত্যেকটি টানে ফুটে উঠত যেন ছবির প্রাণ। আবার যখন কাঁধে তুলে নিতেন বেহালা প্রত্যেক ছরের টানে ঝড়ে পড়ত সুর-মূর্চ্ছনা। তাঁর শেষ জীবনের অধিকাংশ কাজই করেছেন দেব-দেবীদের নিয়ে। তাঁর জীবনের অজানা তথ্যকে লেখার রূপে রূপ দিয়েছেন দুর্গারতন দত্ত। আমাদের পরবর্তী সংখ্যার প্রচ্ছদ তাঁরই করা 'ভারতমাতা'।

বনফুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
চিরন্তন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
কম্প্যু কম্পোজিং অ্যান্ড প্রিন্টিং (ক্যালকাটা)
প্রাইভেট লিমিটেড ৯৬ রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত ও ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-৭০০ ০১৩ থেকে প্রকাশিত।
কার্যালয় ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-৭০০ ০১৩ ফোন ২৭-৪৯৪৩
দিল্লি অফিস সুনীল ভবন সি ১/১০১-১০২ লাজপত নগর
নয়া দিল্লি-১১০০২৪ ফোন: ৬১৭৬৭১
ত্রিপুরা প্রতিনিধি: গোপাল বসু

শনিবারের চিঠি

(প্রথম প্রকাশ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)
(নব পর্যায়) ১ ম বর্ষ ১৬ শ সংখ্যা
২৬ মাঘ, ১৩৯১ □ ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫

সম্পাদক: চিরন্তন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় উপদেষ্টা: সাহিত্য ● রঞ্জনকুমার দাস, সংবাদ ● অজিত চক্রবর্তী
ব্যবস্থাপক: অরুণাংশু ঘোষ
প্রধান কর্মসচিব: শ্যামলী মুখোপাধ্যায়
অলংকরণ ও অঙ্গসজ্জা: আশিস মুখোপাধ্যায়
মুদ্রণ: শহীদুল ইসলাম

একটি দুরন্ত সাফাই অভিযান !
রাজ্য বাজেট
দয়া করে হাত বাড়িয়ে সিগন্যালগুলো যদি ডাউন করে দেন...
প্রার্থী তালিকা

গণতন্ত্রের লাভ ক্ষতিঃ ভারত ও পাকিস্তান

অরুণ বাগচী

বিলেতের 'দ্য ইকনমিস্ট' পত্রিকা সম্প্রতি এক প্রবন্ধ মারফৎ পাশ্চাত্য দেশগুলির বিশেষ পাকিস্তান প্রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। স্বীকার করেছেন বলবনা, কারণ নানা গুণেও আকর্ষণে সমৃদ্ধ ওই পত্রিকাটি সরকারি মুখপত্র নয়। তবে বক্তব্যই বলি আর স্বীকারোক্তিই বলি, কথাটা আমাদের কাছে নতুন কোনও বার্তা বয়ে আনছেনা। আমরা ভালই জানি, বিশেষ করে ব্রিটেন এবং আমেরিকা ভারতীয় উপ-মহাদেশের এই দুটি বড় দেশ ভারত ও পাকিস্তান সম্পর্কে ডবল স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলেন। ভারতের বেলা পান থেকে চুণ খসলে তুলকালাম কান্ড। আর পাকিস্তানের প্রকান্ড সব দোষত্রুটি তাঁদের নজরেই আসেনা। তার সাত খুন মাপ। বাড়ির দুষ্টু ছেলে বা দুষ্টু কুকুর সম্বন্ধে যেমন পরিবারের সবার একটা প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় থাকে, পাকিস্তানের বেলা ঠিক তাই। এতে, ভারতীয় স্বার্থ বিবেচনা করে, আমরা মোটেই খুশি হতে পারিনা। কিন্তু তাতে সাহেবসুবোদের যে কিছু যায় আসে তা মনে হয়না। নেহাৎই ভারতের নেতৃত্ব সেই স্বাধীনতার লগ্ন থেকেই প্রথম শ্রেণীর। নেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ইন্দিরা, লালবাহাদুর, রাধাকৃষ্ণণ, মোরারজি, জাকির হুসেন-এঁরা সবাই এত বড় মাপের এবং এঁদের অনেকেই এমন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে তাঁদের অগ্রাহ্য করা মুশকিল। ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে, আয়তনের বিচার অথবা রাজনৈতিক তাৎপর্যের নিরিখে ভারত এতই বড় যে, তাকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। একা জওহরলাল তাঁর সদ্য স্বাধীন দেশটিকে এমন উচ্চ আসনে বসিয়ে গেছেন যে তার নাগাল পাওয়া শক্ত। নইলে পাকিস্তানের নাকে কান্না এবং আবদার মেনে নিয়ে বহু আগেই ভারতকে ঠেঁসে শিক্ষা দিয়ে দিতেন ইসলামাবাদের দয়ার্দ্রচিত্ত অভিভাবকরা। এখনও পাকিস্তানের হাতে লাঠি তুলে দিচ্ছেন, যাও বাছা, চোখের জল মুছে শত্তুরদের দুঘা লাগিয়ে এসো।

একথা অনস্বীকার্য যে ব্রিটেন আমেরিকা দুইই গণতন্ত্রী দেশ। আদর্শ গণতন্ত্রী দেশ। যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ওই দেশের মানুষদের লভ্য, তার তুলনা মেলা ভার। ব্রিটেন তো সংসদীয় গণতন্ত্রের গোমুখী। তার আলো থেকে আলো নিয়েই কত দেশে কত প্রদীপ জ্বলছে। সব প্রদীপ সমান তেজে সমান মাধুর্যে জ্বলছেনা। কিন্তু উৎস ওই ব্রিটেন। আমেরিকান নাগরিক কী পরিমাণ বাক ও কর্মের স্বাধীনতা ভোগ করেন তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। দেশের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত প্রেসিডেন্টকে যে ধরণের সমালোচনার বা কটূক্তির সম্মুখীন হতে হয় তার সিকির সিকি উচ্চারণে বহু দেশে গর্দান যাবে। ১৯৬৬ সালে জীবনে প্রথমবার ওয়াশিংটনে পা দিয়ে প্রথম সন্ধ্যাতেই টিভি প্রোগ্রামে দেখলাম একটি বই নিয়ে আলোচনা। সেদিনই প্রকাশিত বইটির লেখক প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে হত্যা করা হয়েছে যাদের ষড়যন্ত্রে তার মধ্যে আছেন তদানীন্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি জনসন। মনে রাখতে হবে ওই ৬৬ সালের নভেম্বরে, যখন বইটি বাজারে বের হল, জনসন তখন প্রেসিডেন্ট অব দ্য ইউনাইটেড স্টেট্স অব আমেরিকা। মনে হয়না যে জনসন সম্বন্ধে ওই অভিযোগ কেউ খুব গুরুত্ব দিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু কথা তা নয়। বিষয় হল, একজন মার্কিন নাগরিক অতখানি এগোবার সাহস রাখেন, এসব অভিযোগ তোলেন যা অন্যদেশে তুললে অভিযোক্তার জীবিত থাকাই ক্ষেত্রবিশেষ কঠিন হত। গণতান্ত্রিক অধিকারের মর্যাদা কতখানি স্বীকৃত হলে এটা সম্ভব সেটা ভেবে দেখবার।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই আমেরিকাই গত তিরিশ বছর প্রায় একটানা সমর্থন জুগিয়ে এসেছে পাকিস্তানকে, যে পাকিস্তান গণতন্ত্র থেকে শতহস্ত দূরে। স্বাধীনতার প্রায় পর থেকেই ওদেশে গণতন্ত্র কার্যত লুপ্ত। জিন্না সাহেব দীর্ঘজীবী হলে, বা লিয়াকৎ আলি খাঁ হঠাৎ খুন হয়ে না গেলে কী হত কে জানে! কিন্তু মহম্মদ আলি, সুরাবর্দী, ফজলুল হক প্রভৃতি মিলেও কখনও পাকিস্তানকে গণতন্ত্রী বানাতে পারেনি। জেড এ ভুট্টো মুখে বিস্তর গণতন্ত্রের কথা বলতেন। কাজে কর্মে তাঁর আচরণ থেকে গণতন্ত্রে বিশ্বাসের প্রমাণ আদৌ মেলেনা। নইলে বিপুল সংখ্যাধিক্যে নির্বাচন জেতা আওয়ামি লীগের নেতা হিসাবে শেখ মুজিবকে তাঁর প্রাপ্য পদ দিতে অত আপত্তি দেখাতেন না ভুট্টো। ইয়েইয়া খাঁকে পরামর্শ দিতেন না পূর্ব পাকিস্তানকে সবলে দাবিয়ে দিতে। আর উর্দি পরে যারা ইসলামাবাদে কর্তামি করেছেন সেই ইস্কান্দার মির্জা, আয়ুব খাঁ, ইয়েইয়া খাঁ, জিয়া উল হক প্রভৃতিতো ছিলেন মার্কিন প্রশাসনের নয়নের মণি একেকজন। তাঁদের দেশে গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত, নাগরিক স্বাধীনতা কার্যত অনুপস্থিত, অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা নেই। সীমান্ত গান্ধী অহিংসা-সেবী খান আব্দুল গফ্ফর খান সেই ব্রিটিশ আমলেও জেল খেটেছেন। তাঁর বাকি জীবনটাও পাকিস্তানের জেলে জেলেই কাটলো। কত স্বাধীনচেতা মানুষ যে জেলে পচছেন অথবা আপন আপন পছন্দমত আদর্শমত চলতে না পারায় ভগ্নোদ্যম ভগ্নস্বাস্থ্য কে তার হিসাব রাখে। কাশ্মীর নিয়ে ব্রিটেন আমেরিকা যখনই পেরেছে ভারতকে খুঁচিয়েছে। ভারত গণভোট না করে তার কথার খেলাপ করেছে এই অভিযোগ সর্বদা উদ্যত। অথচ এই ৩৭ বছরে পাকিস্তান যে ভারতকে দত্ত একটি প্রতিশ্রুতিও রাখেনি তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই ওই দুই দেশের। কাশ্মীর সীমান্ত দিয়ে বার বার হানাদার পাঠিয়েছে পাকিস্তান, নাশকতামূলক কাজকর্ম করার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে উগ্রপন্থীদের ভারতে পাঠাচ্ছে, পঞ্জাবে উগ্রপন্থী ও খলিস্তানীদের মদত জোগাচ্ছে। কাশ্মীরীদের কিছু নেতাকে পাকিস্তানে এবং লন্ডনে থাকা খাওয়ার জামাই খরচা দিয়ে যাচ্ছে। বার্মিংহামের ভারতীয় কূটনীতিক মাত্রেকে অপহরণ ও হত্যা করার জন্য যারা দায়ী তাদের অনেকেই পাকিস্তানী মদতপুষ্ট। বিমান ছিনতাই নিয়ে পৃথিবীব্যাপী হইচই এবং ধিক্কার। অথচ ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে যারা পাকিস্তানে পালিয়ে গেছে তারা সেখানে মহানন্দে আছে। স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে তাদের কোনও অসুবিধেই হচ্ছেনা।

অস্ত্র সাহায্যের ব্যাপারটাই ধরুন। বরাবর ভারতের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে এক নাগাড়ে পাকিস্তানকে অস্ত্রসাহায্য দিয়ে গেছে আমেরিকা। প্রথমে যুক্তি ছিল, পাকিস্তান সিটো সেন্টোর সদস্য হিসাবে এশিয়ায় সাম্যবাদকে (অর্থাৎ চীনকে) রুখবে। যখন দেখা গেল ৬২ সালের পর পাকিস্তান এবং চীনে পরম দোস্তি, তখনও এই মার্কিনী যুক্তি বহাল রইল। ৬৫ এবং ৭১ সালে ভারত যখন প্রমাণ দিয়ে দিল যে মার্কিনী অস্ত্র পাকিস্তানের কর্তারা ব্যবহার করেছেন ভারতেরই বিরুদ্ধে তখন চুপ করে রইল মার্কিন সরকার। এখনও অস্ত্র সাহায্য রমারম যাচ্ছে পাকিস্তানে। এখন যুক্তি, আফগানিস্তানে এসে গেছে রাশিয়া। পাকিস্তান বিপন্ন বোধ করছে, আক্রান্ত হতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। অতএব ওই অস্ত্রসাহায্য দরকার। বার বার আমেরিকাকে বলা হয়েছে যে চিরকাল পাকিস্তান যা করেছে, ভবিষ্যতেও তাই করবে। অস্ত্র বিমান সবই শুধু ভারতকে টক্কর দেবার জন্য। রাশিয়াকে ঠেকানোর জন্য নয়। সে মুরোদ বা অভিপ্রায় কোনটাই পাকিস্তানের নেই। পাকিস্তান এখনও ভাঁওতা দিচ্ছে। আফগানিস্তান থেকে

আক্রমণের ভয় যদি এতই বেশি, তবে পাক সৈন্যের দশভাগের নয় ভাগ ভারতসীমান্তে মোতায়েন কেন? ভারত সীমান্তে অত টহলদারি কেন? উত্তরে আমেরিকা তোতাপাখির মত একটি আশ্বাসই দিয়ে আসছে: "কোনও চিন্তা নেই। আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি, আমরা যে অস্ত্রসাহায্য দিচ্ছি পাকিস্তানকে তা কখনই ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবেনা।". এই অন্তঃসারহীন আশ্বাস কোন মুখে এখনও আমেরিকা দিতে পারছে তা নিয়ে এদেশে বা বিদেশে বোধকরি কেউই আর বিস্মিত হবেন না। সব কিছুরই একটা সীমা থাকে।

মোদ্দা কথা হল, যথার্থ গণতন্ত্রী দেশ ব্রিটেন আমেরিকা অগণতন্ত্রী পাকিস্তানকে নৈতিক সমর্থন ক্রমাগত জুগিয়েছে। ভারতে সেই জরুরী অবস্থা জারি হবার সময় গণতন্ত্রের জন্য ওসব দেশে কত অশ্রুপাত। অথচ পাকিস্তানের বেলা সেই আঁখি দুটি অন্ধ। আর ঢেলে পাকিস্তানকে "কমিউনিস্ট তাড়ানো" অস্ত্র সাহায্য দিয়ে আমেরিকা ভারতকে বাধ্য করেছে অস্ত্রশস্ত্রের খাতে খরচ বাড়াতে। এশিয়ার এই খন্ডে অস্ত্র প্রতিযোগিতা চালু হয়ে গেছে। মুখে নিরস্ত্রীকরণের বাণী বলেও ভারত পৃথিবীর বাজারে নেমে পড়েছে অস্ত্র কেনাকাটা করতে। গণতন্ত্রী দেশ ভারত পিছিয়ে পড়ছে তার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের কর্মসূচী থেকে। তাতে গণতন্ত্রের শেষ পর্যন্ত কী লাভ? □

ধর্মঘটী ইঞ্জিনিয়ারদের মাইনে কাটা গেল

নিজস্ব প্রতিনিধি

পেশাদার ঘাতক যেমন নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে শানিয়ে নেয় নিজের ছুরি ধর্মঘটী ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতি রাজ্য সরকারের মনোভাবটিও অবিকল সেইরকম। ফেটো'র সদস্যদের বিরুদ্ধে এখন তারা অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। এককালের ধর্মঘটপ্রেমী সরকার ধর্মঘটী কর্মীদের ওপর কতটা প্রতিশোধ পরায়ণ হতে পারেন রাজ্য অর্থ দপ্তরের গত ২১শে জানুয়ারির মেমোরান্ডামটি তার একটি নজীর হতে পারে। মেমোরান্ডামটির নাম্বার ৬২১-এফ। পাঁচ দফা প্রস্তাব সম্বলিত এই এক পাতার আদেশ পত্রটির মূল কথা হল গত ১.১২.৮৪ থেকে ১৭.১২.৮৪ পর্যন্ত তিন দফা দাবীর সমর্থনে যাঁরা যাঁরা অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হয়ে ছিলেন তাঁদের ঐদিনগুলির বেতন কাটা যাবে এবং এবাবদ অন্যান্য বকেয়াও তাঁরা পাবেন না। যারা অগ্রিম বা অন্যকোন ভাবে বেতন আগে থেকেই নিয়ে রেখেছেন তাদেরও রেহাই নেই। পরের মাসের মাইনে থেকে ঐ টাকা বাদ যাবে।

ইঞ্জিনীয়ারদের প্রকাশ্য সম্মেলন

শুধুমাত্র আন্দোলনকারী ইঞ্জিনিয়াররাই নন গোটা দফতরের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারদের মানসম্মান এখন তাঁদের ওপরওয়ালাদের হাতে। বিশেষ কোন ইঞ্জিনিয়ার ঐদিন কাজে এসেছেন কিনা তাঁদের যদি সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ হয় তবে তাঁরা সংশ্লিষ্ট অফিসারটিকে দাবীর সমর্থনে প্রমান দাখিল করতে বলতে পারেন। অবশ্য কৃপা করে তাঁরা চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং তার ওপরের স্তরের কর্মীদের এইসব ব্যবস্থার আওতা থেকে বাদ দিয়েছেন।

স্বাভাবিক কারণেই এই সিদ্ধান্তে সাধারণভাবে সমগ্র ইঞ্জিনিয়ার মহলেই তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে এখন রাজ্যসরকার বেতন কাটার সমর্থনে আইনি ব্যবস্থার দোহাই দিলেও অতীতে তাঁরা নিজেদের সমর্থনে ধর্মঘট কর্মবিরতি ইত্যাদির সময় নিজেরাই বহুবার এই আইন ভেঙেছেন। গত ৪.৯.৮৪ তারিখের কর্মবিরতির সময়ও কর্মীদের কোন বেতন কাটা হয়নি। ফেটো, দ্য ফোরাম অফ প্রফেশনালস ইত্যাদি ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারদের সংগঠনগুলি একযোগে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

আগামী ২৯.১.৮৫ তারিখে ফেটো এই সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে একটা প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করেছেন। মিছিলের শেষে তারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেবেন। প্রতিবাদ যে শুধু শহরেই সীমাবদ্ধ থাকছে এমন নয় আন্দোলনকারীরা এই বিক্ষোভকে তাঁরা জেলাস্তরেও ছড়িয়ে দিতে চান।

উদ্দেশ্য এক হলেও ফোরাম অফ প্রফেশনালস-দের প্রতিবাদের ধরনটা একটু অন্য রকম। প্রতিবাদ জানাতে তাঁরা করবেন অবস্থান ধর্মঘট এবং আগামী মাসগুলিতে ছোট ছোট বহু পথসভা। বিক্ষোভ জানাতে বুকে লাগাবেন ব্যাজ।

ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বনাম সরকারের এই মনকষাকষির আসল ধকলটা পোহাতে হয় এই রাজ্যের সাধারণ মানুষকেই। সরকারি সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে যদি তাঁরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যান তাতে এই রাজ্যের ক্ষতি। পায়াভারী আমলাকুল, সুবিধাভোগী মন্ত্রীদের গায়ে তাতে কোন আঁচড়টিও পড়বেনা। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারদের অতীতের আন্দোলনও সাধারণমানুষদের দুঃসহ অভিজ্ঞতা উপহার দিয়েছিল। ছাপোষা মানুষ আর এই অভিজ্ঞতা ফিরে পেতে চাননা। □

চলচ্চিত্র উৎসবে বিশৃঙ্খলার নেপথ্যে

বিশেষ প্রতিনিধি

দিল্লিতে এবারে দশম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যে চরম বিশৃঙ্খলা এবং উৎসব কর্তৃপক্ষের শিক্ষানবিশী অনভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনার নজির দেশী বিদেশী গুণীজন এবং দর্শকেরা প্রত্যক্ষ করলেন তাতে স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠেছে উৎসব কর্তৃপক্ষের এই ধরণের কোন আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার আদৌ কোন যোগ্যতা আছে কিনা বা ভবিষ্যতে তাদের হাতে চলচ্চিত্র উৎসবের দায়িত্ব দেওয়া উচিত কিনা? কারণ "মর্ণিং শোজ দি ডে" প্রবাদের মত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিশৃঙ্খলা এবং অব্যবস্থার সেই 'ট্র্যাডিশান' অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে তারা প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানেই বজায় রেখেছেন।

এই ধরণের কোন অনুষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারটি সঙ্গে ভারতের জাতীয় মর্যাদার প্রশ্নটিও অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। কিন্তু উৎসব কর্তৃপক্ষের তাতে কিছু যায় আসেন না। উৎসব অধিকর্তা বীরেন লুথার এ ব্যাপারে অনেকটা নির্বিকল্প ব্রহ্মের মত। মিথিক্যাল মঙ্কীদের সেই "সি সো ইভিল, হিয়ার নো ইভিল এন্ড স্পিক নো ইভিল" এর আপ্তবাক্য স্মরণ করে তিনি পাঁচতারা অশোকা হাটেলের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে নির্মিলিত শিবনেত্র হয়ে বেশির ভাগ সময় 'মকারের' সাধনায় নিমজ্জিত ছিলেন। এসব ছোটখাট ব্যাপারে নজর দিয়ে অযথা টেনশান বাড়িয়ে লাভ কি। খুঁটির জোর থাকলে সাংবাদিকদের হৈ চৈ কে ভয় করে কোন শর্মা। কিন্তু লুথার সাহেবের ভাগ্যের পশ্চিম আকাশে বোধহয় ঘন কালো মেঘ জমতে সুরু করেছে। শোনা যাচ্ছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ঐ চরম বিশৃঙ্খলা এবং উৎসব কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে ইতিমধ্যেই নাকি তদন্তের আদেশ জারী করা হয়েছে।

মজার কথা হল যে ভারতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হয় প্রতি দু বছর অন্তর। মধ্যবর্তী বছরটিতে অনুষ্ঠিত হয় ফিল্মোৎসব। কাজেই উৎসব কর্তৃপক্ষের কাছে এটি একটি নিয়মিত বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মতই এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার মতই চলচ্চিত্র উৎসবের তারিখও নির্দিষ্ট -- ৩ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি। চলচ্চিত্র উৎসব পরিচালনা এন. এফ. ডি. সি-র কাজের অন্যতম অংশও। কাজেই এমন নয় যে হঠাৎ এবং অল্প সময়ের মধ্যে এই ধরণের একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়েছে বলে তারা বেসামাল হয়ে পড়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের বিষদ বিবরণী ইতিমধ্যেই শনিবারের চিঠির পাঠকেরা সংবাদপত্রে পড়েছেন তাই এই প্রতিবেদনে তার আর বিষদ পুনরুল্লেখ করা হচ্ছে না। তবে একটা কথা না বলে পারছি না যে

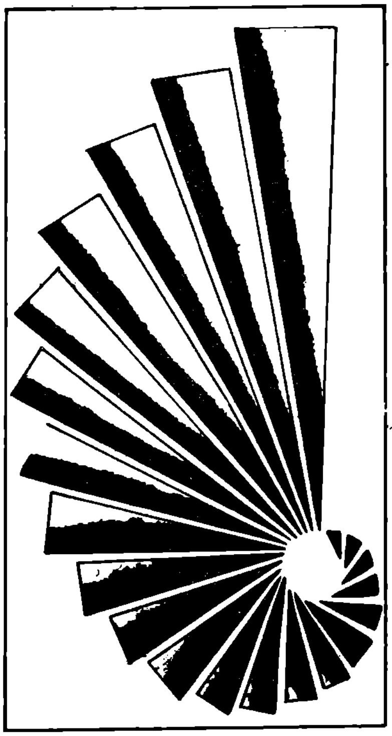

সচরাচর এই ধরণের কোন আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠান সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনার জন্যে আগে ভাগে মহড়া দেওয়া হয়ে থাকে। এবং সেটাই নিয়ম। কিন্তু জুরী প্রধান জান মরো সহ জুরীর দল এবং বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দকে প্রায় আড়াল করে সারা স্টেজ জুড়ে বোম্বাই চিত্র জগতের তারকাদের দিয়ে এমন একটা বিশৃঙ্খল এবং অগোছালো পরিবেশ সৃষ্টি করা হল তাতে আর যাই হোক উৎসব কর্তৃপক্ষের সামান্যতম যোগ্যতা এবং দক্ষতার পরিচয় প্রকাশ করে না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রবিশঙ্কর, মৃণাল সেন, কে. কে. আব্বাস, আদূর গোপালকৃষ্ণন এবং নৌসাদের মত ব্যক্তিরাও প্রায় পাত্তাই পেলেন না। এন. এফ. ডি. সি-র চেয়ারম্যান ঋষিকেশ মুখার্জীকে মঞ্চের এক কোনে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির মত বসে থাকতে দেখা গেল। কল্কে পেলেন না আঞ্চলিক প্রখ্যাত পরিচালকরাও। আদূর গোপালকৃষ্ণন তো হাল ছেড়ে বাইরেই চলে গেলেন। অথচ উৎসবটা চলচ্চিত্র উৎসব।

উৎসবের ছবিগুলির কোন আগামী সংক্ষিপ্তসার এবং স্ক্রিনিং শিডিউল আগে ভাগে তৈরি করা হয় নি। ফলে কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে সাংবাদিকেরা প্রায় কিছুই জানতে সক্ষম হন নি। শেষ মুহূর্তে কোন রকমে জোড়তালি দিয়ে সাংক্ষিপ্তসার যা দেওয়া হল তা কর্তৃপক্ষ ভাল করে খুঁটিয়েও দেখেন নি। অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি রিভিউ কে কর্তৃপক্ষ অম্লানবদনে 'সিনপসিস' বলে চালিয়ে দিলেন।

উৎসব আরম্ভের শেষ সময় পর্যন্ত উৎসব কর্তারা নিশ্চিত ছিলেন না যে জুরীদের প্রধান কাকে করা হবে। ভাগ্যক্রমে জান মরোকে পাওয়া যেতে তাদের মুখ রক্ষা হয়। ৯ জন জুরীর ভেতর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৭ জন।

'ফোকাস অন ল্যাটিন আমেরিকান সিনেমা' বলে ঢাক ঢোল বাজিয়ে যে ছবিগুলো দেখানো হলো তাদের বেশির ভাগই আগে ভারতে প্রদর্শিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সুষ্ঠ পরিচালনার দায়িত্ব ভার যে মহিলার ওপর অর্পন করা হয়েছিলো -- তাঁর ল্যাটিন আমেরিকার চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত কোন অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হল না। কারণ একটি মাত্র ছবি ছাড়া ল্যাটিন আমেরিকার মেক্সিকোর কিছু ছবি অন্যান্য চলচ্চিত্র উৎসবে একটা বিশিষ্ট অবদান রেখে পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করা সত্ত্বেও মেক্সিকোর ছবি বেশি দেখাবার প্রয়োজন মনে করেন নি কর্তৃপক্ষ। সম্ভবতঃ এই বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত ঐ মহিলার স্বামী ল্যাটিন আমেরিকার এক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বলে উৎসব কর্তৃপক্ষ তাঁর চেয়ে যোগ্য আর কাউকে খুঁজে পান নি।

প্রেস শো গুলিতে এক চরম অব্যবস্থা। আসনগুলি দখল করে যারা ছবি দেখেছেন তাদের একটা বেশ বড় অংশই যে প্রেস,

ডেলিগেট বা চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নন তা বুঝতে অসুবিধা হয় নি। আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব এবং শাস্ত্রীভবনের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের উঁচুতলার অফিসার, কর্মী ও তাদের চেনা-জানার ভীড়ে প্রেস প্রায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে গেছে। মবলঙকর হলে তো একদিন খন্ড যুদ্ধই হয়ে গেল। প্রেস শোতে এত বাইরের লোক আসে কি করে!

উৎসব কর্তৃপক্ষের এই স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনতোষণ এবং কর্তাভজা মনোভাবের ঝক্কি পোহাতে হয় প্রেস ইনফরমেশান ব্যুরোর অফিসারদের। এটা প্রতিবারের ঘটনা। এবারে নাকি তাই পি. আই. বি. পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উৎসবে নিজেদের যুক্ত করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু প্রায় শেষ সময়ে শাস্ত্রীভবনের চাপে তাদের আসরে নামতে হয়েছে। উৎসব কর্তৃপক্ষ পি. আই. বি-র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের না জানিয়েই অঢেল পাশ দিয়েছেন চেনাজানা পেয়ারের লোকদের। ফলে পি. আই. বি-র এক্রিডেটেড সাংবাদিক এবং ফিল্ম ক্রিটিক প্রভৃতি চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হিসেব করা সংখ্যা ছাপিয়ে ভীড় করেছেন অভ্যাগতের দল। সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় বিপর্যস্ত হয়েছেন পি. আই. বি-র লোকের। এই ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কি আশা করা যেতে পারে। অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের যথেচ্ছ আনাগোনায় হেনস্তা হতে হয়েছে প্রকৃত সংবাদপত্রের লোকেদের। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল এবার এই প্রথম এন্ট্রি গেটে পাহারা দিতে মাঝ পথে আনা হয়েছে একটি বেসরকারি ডিটেকটিভ সংস্থার কর্মীদের। কিন্তু তারা আটকাবে কাদের যারা এসে ভীড় করছে তারা তো উৎসব কর্তৃপক্ষেরই অনুগ্রহভাজন এবং উঁচু মহলের কাছের লোক।

সিকরেট প্লেসেস (ইংল্যান্ড)

দি হাউজ ওয়ারমিং (হাঙ্গেরি)

গত বছর বোম্বাই ফিল্মোৎসব থেকেই ডকুমেন্টারী ছবির একটা আলাদা বিভাগ করা হয়েছে। সেই DOCUMEDIA উপলক্ষে ডকুমেন্টারী চিত্রের ওপর একটি বিশেষ ভাবে আয়োজিত সেমিনারে ডাকা হয় নি Film Division এর পরিচালক এবং প্রডিউসারদের। অথচ তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের নিজস্ব দপ্তর এই ফিল্ম ডিভিশান পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশি সংখ্যক ডকুমেন্টারী চিত্র নির্মানের গৌরব বহন করছে। মন্ত্রকের নিজস্ব দপ্তরের প্রতি অবহেলার একটা কারণ খুঁজে পাওয়া গেলেও প্রখ্যাত ডকুমেন্টারী এবং স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র প্রস্তুতকারী এন. এস. থাপা. বি. ডি. গর্গ. এবং হোমি সেঠনারী মত ব্যক্তিকে কেন আমন্ত্রণ জানান হয়নি তার কি ব্যাখ্যা উৎসব কর্তৃপক্ষ দেবেন কিনা জানিনা কিন্তু তাতে আর যাই হক ভাল বিদেশী চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে ভারতীয় চলচ্চিত্র চেতনার এক পরিবর্তন আনবার মূখ্য যে প্রয়াস এই উৎসবগুলির উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্য তা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে চলচ্চিত্র উৎসবের দায়িত্বে রয়েছেন এমন একটা সংস্থায় এই ধরণের অব্যবস্থা এবং অপেশাদারী ব্যাপারগুলো হচ্ছে কেন। এর উত্তর একটাই। এক দল চলচ্চিত্র জগত সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, খুঁটির জোরে আসা, কিছু কর্তাভজা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এর বেশি কিছু প্রত্যাশা করা যায় না।

লুথার সাহেব স্বয়ং একটি গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানিতে কাজ করতেন। মুরুব্বীর জোরে উৎসব অধিকর্তার পদটি পেয়েছেন গত বছরে। চলচ্চিত্র সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা যে কোন রাম শ্যাম যদুর মতই। গত ৪ বছরে এই সংস্থার অন্ততঃ দুজন

গৌতম ঘোষের "পার"

ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট –ফিনল্যান্ড

ডেপুটি ডিরেকটার নেওয়া হয়েছে যাদের চলচ্চিত্র এবং জনসংযোগ সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা এবং ধারণাই নেই।

তাদের মধ্যে একজন এন. এফ ডি. সি-র প্রাক্তন ম্যানিজিং ডাইরেকটরের স্টেনোগ্রাফার ছিলেন। আর একজন প্রাক্তন ব্যাঙ্ক কর্মীকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের একজন উচ্চ পদস্থ কর্তার বিশেষ ইচ্ছায় ডেপুটি ডিরেকটরের পদে নেওয়া হয়েছে এ চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পর্কে এবং চলচ্চিত্র জগত সম্পর্কে অভিজ্ঞ বেশ কিছু প্রার্থীকে নাকচ করে। কাজেই তাদের অযোগ্যতার প্রতিফলন স্বাভাবিক কারণেই চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিটি অনুষ্ঠানে প্রকট হয়ে উঠেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ঘোষণায় রাজ বব্বর তার ব্যর্থতার জন্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে দায়ী করেছেন উৎসব কর্তৃপক্ষকে। অনুষ্ঠানের অনেক আগে বোম্বাই থেকে উড়ে এসে পূর্ব ব্যবস্থামত তিনি অনেক চেষ্টা করেও উৎসব কর্তৃপক্ষের জনৈক বিনোদ পান্ডের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। ওই মহাপুরুষকে যে কোথায় পাওয়া যাবে তাও নাকি তাকে কেউ হদিশ দিতে পারেন নি। কাজেই সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হয়েই তাকে একদম মঞ্চে এসে ঘোষণার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছে।

উৎসবের তরফ থেকে ছবি নির্বাচন করতে যারা বিদেশে যান তাদের বিশ্বচলচ্চিত্র জগত সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব। কেবলমাত্র ওপর মহলের খুঁটির জোরে বিদেশে প্রমোদ ভ্রমনই হচ্ছে তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই সব কারণে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবের মান সম্পর্কেও বিদেশে একটা বিরূপ ধারণা রয়েছে। কান, বার্লিন, মস্কো, ভেনিস প্রভৃতি বড় মাপের মর্যাদা সম্পন্ন উৎসবের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবের পুরস্কার বিদেশী চিত্র নির্মাতাদের উৎসাহিত করে না। তাই তারা সচরাচর ভাল ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠাতে চান না।

বিদেশে চলচ্চিত্র উৎসবগুলিতে ধারাবাহিক ভাবে একটা প্রস্তুতি থাকে। এখানে উৎসব কর্তৃপক্ষের প্রায় শেষ মুহূর্তে নিদ্রাভঙ্গ হয়ে থাকে। তাই তড়িঘড়ি কোন

রকমে একটা জোড়াতালি দিয়ে যা উপস্থাপিত করা হয় সেখানে অব্যবস্থা এবং বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কি বা হতে পারে।

লাখ লাখ টাকা খরচা করে একদল অনভিজ্ঞ, অদক্ষ এবং ভাগ্যবান কিছু ব্যক্তির হাতে চলচ্চিত্র উৎসবের দায়িত্ব না দিয়ে সরকার কি প্রকৃত অভিজ্ঞ এবং সুদক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সংস্থা গঠন করতে পারেন না। চলচ্চিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভাব তো এদেশে নেই।

প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী একটি প্রচ্ছন্ন প্রশাসন এবং দুর্নীতি মুক্ত ব্যবস্থার চেষ্টা চালাচ্ছেন। অযোগ্য এবং অপদার্থ ব্যক্তিদের সাফাই অভিযানে উৎসব সংগঠনের কিছু খুঁটির জোরে আসা কর্তাব্যক্তিকে তিনি যদি বিতাড়িত করতে পারেন তবে অন্ততঃ এই সংস্থাটি স্বখাত সলিলে ডুবে মরার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারবে। মুখ রক্ষা হবে ভারতেরও। □

জার্মান ছবি 'ট্রমা'

চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে আর ছেলে খেলা নয়

আশিসতরু মুখোপাধ্যায়

গোটা পৃথিবী জুড়ে চলচ্চিত্র উৎসব হয় একশোরও বেশি। তার মধ্যে সেরা তিনটি। ভেনিস, বার্লিন, কান। এটা ঠিক, ভারতের চলচ্চিত্র উৎসবের মান বিশ্বমানের নয়। যদিও এশিয়ার একমাত্র নিয়মিত চলচ্চিত্র উৎসব এটি। সরকারি আমলার বদলে যদি সত্যিকারের চলচ্চিত্র প্রেমী মানুষেরা এগিয়ে আসেন তবে ভারত পারে এশিয়াকে নেতৃত্ব দিতে। এবারে ভারতের চলচ্চিত্র উৎসব দ্বিতীয় দশকে পড়ল। কুড়িবছরের উৎসবকে নিয়ে আর ছেলেখেলা নয়। এবারে কিছু করা জরুরী। প্রয়োজন আত্ম-বিশ্লেষণেরও।

এবারে দিল্লীতে দশম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী-সন্ধ্যা ধুলোয় লুটলো। অতিথিদের বদলে মঞ্চে তুলে দেওয়া হল বোম্বাইয়ের গ্ল্যামার-সর্বস্ব চিত্রতারকাদের। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের পরিবর্তে ফ্যাশন প্যারেড। ভাবতে অবাক লাগে রবিশঙ্কর, মৃণাল সেনের মত বড় মাপের ব্যক্তিত্ব স্থান পায় না মঞ্চে। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের চলচ্চিত্র-পরিচালকেরা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ডাকা হয় না। তাই উৎসব বয়কট করে ফিরে এলেন মৃণাল সেন। উৎসবের উদ্বোধনী তামাশা নিয়ে এই প্রতিবেদককে তিনি বলেছিলেন, হাস্যকর সার্কাসের ঘটনার জন্য দায়ী ফেস্টিভ্যালের পরিচালকগোষ্ঠী। আমরা যারা চলচ্চিত্রকে সস্তা পণ্য হিসেবে দেখতে নারাজ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবের অংশীদার, তারা সবাই এই অট্টহাস্যকর ঘটনায় স্তম্ভিত, মর্মাহত ও লজ্জিত। ব্যক্তিগতভাবে চলচ্চিত্র উৎসবে-জাতীয় কোনরকম সাংস্কৃতিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে সরকারি মাথা গলানো আমি পছন্দ করি না। কিন্তু দিল্লির ঘটনা এবার যতদূর গড়িয়েছে তাতে মনে করি, অন্তত একবারের জন্যও সরকারের প্রয়োজন উৎসব-কর্তৃপক্ষকে কিঞ্চিত শাসিয়ে দেওয়া। তা না হলে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ ইন্ডিয়ান প্যানোরামা। এটি শুরু হয়েছে ১৯৭৮ সাল থেকে। সারা ভারতের ৭০০ ছবির মধ্যে এবারে ২১ টি ছবি স্থান পেয়েছিল। তার মধ্যে ১০ টিই হিন্দি। বাংলা মাত্র একটি। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, আঞ্চলিক ছবি উপেক্ষিত কেন? আসলে প্রদীপের নিচেই অন্ধকার। উৎসব পরিচালক ও এন. এফ. ডি. সি-র (ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন) কর্মীরা বোম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া ওই সরকারি সংস্থার মধ্যেই তো বাণিজ্যিক ছবির ব্যবসায়ীরা ঢুকে বসে আছেন। তাঁদের ছবি প্যানোরামায় দেখালে বাণিজ্য হবে বিদেশে। অথচ প্যানোরামার আদর্শে তা নয়। বিদেশী দর্শকদের কাছে ভারতের নানা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক চেহারাটা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরাটাই হল একমাত্র উদ্দেশ্য। গত চার-পাঁচ বছরে প্যানোরামায় গড়ে স্থান পেয়ে আসছিল ৪ টি হিন্দি ছবি। এবারে এক বছরের ব্যবধানেই লাফিয়ে চলে গেল ১০-এ। বিস্ময়ের ঘটনা অবশ্যই। সন্দেহ হয়, এই পক্ষপাতিত্ব কি হিন্দি চলচ্চিত্রের তিন তারকার লোকসভার সদস্য হওয়ার জন্য? এবারে এই যদি দৃষ্টান্ত হয় তাহলে আগামী উৎসবে কী হবে!

বাংলা ছবির অবস্থাটা খুবই শোচনীয়। সরোজ দে পরিচালিত 'কোনি' ছিল প্যানোরামার একমাত্র বাংলা ছবি। অথচ কয়েক বছর আগেও উনিশশো আশি সালে প্যানোরামায় ছিল চারটে বাংলা ছবি। জানি না, জাতীয় পুরস্কার পাওয়া ছবি শেখর চ্যাটার্জির 'বসুন্ধরা', শংকর ভট্টাচার্যের 'অন্বেষণ' ও পীযুষ গাঙ্গুলির 'দেবী গর্জন' বাদ পড়ল কি করে? তাহলে ছবিগুলো কি নিম্নমানের? বাংলা ছবির সার্বিক মান ক্রমশ যে নিচে নামছে এতার বড় প্রমাণ। এবারের

অনধিগম্য

চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম জুরি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, প্যানোরামায় 'কোনি' ছাড়া আর কোন বাংলা ছবি গেল না কেন? সৌমিত্রবাবু বেশ জোর দিয়েই বললেন, আন্তর্জাতিক মানের ছবি বাংলায় কটা হচ্ছে যে উৎসবে যাবে?

কথাটা মিথ্যে নয়। বাংলা ছবির মান সত্যিই পড়ে গেছে। কারণ কি আত্ম-অহমিকা? তবে আত্মবিশ্লেষণের সময় এসে গেছে। এই মুহূর্তে সজাগ না হলে আগামী প্যানোরামায় একটাও জায়গা পাবে না বাংলা ছবি। ভাল বাংলা ছবি চলে না বলেই মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, বিপ্লব রায়চৌধুরী, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ বাঙালি পরিচালকেরা সর্বভারতীয় বাজার পেতে তৈরি করছেন হিন্দি ছবি। আঞ্চলিক ছবির ক্ষেত্রে বাংলা ছবির অপমৃত্যু ঘটলে ভবিষ্যতে ইন্ডিয়ান না হয়ে হিন্দি প্যানোরামা হতে বেশি বিলম্ব ঘটবে না।

দিল্লির চলচ্চিত্র উৎসবে এবারে সাড়া জাগানো ছবি যে আসেনি সেকথা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে এই প্রতিবেদককে বললেন, এবারের প্রতিযোগিতায় এমন কোন ছবি ছিল না যাকে মাস্টারপিস বলা যায়। বাছাই করে নেওয়া বাইশটা দেশের তেইশটা ছবির মধ্যে আমরা একটি ছবিও পেলাম না যাকে চোখ বুজে শ্রেষ্ঠ ছবির সোনার ময়ূরটি দেওয়া যায়।

এবারে স্বর্ণময়ূর ভাগাভাগি হল যুক্তরাজ্যের 'দি বস্টনিয়ানস' আর সোভিয়েত ইউনিয়নের 'রুথলেস রোমান্স' এর মধ্যে। অথচ এই দুটো ছবি ১৯৮৪ সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতার অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। আর আমরা সেই অযোগ্য ছবিকে পুরস্কৃত করলাম। এই থেকেই অনুমেয় ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মান কতটা নিম্ন মানের। আমাদের উৎসব-কর্তৃপক্ষের লোকেরা ভেনিস, কান, বার্লিন, লোকার্নো, মন্ট্রিল ইত্যাদি বিশ্বের সেরা উৎসবগুলোয় সারা বছর ঘুরেও একটা ভাল ছবি যোগাড় করতে পারেন না। অথচ কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ব্যায় হচ্ছে তাঁদের জন্য প্রতি বছর। এবার তো ৭০ লক্ষ টাকায় উৎসব শেষ হল। তাহলে আন্তর্জাতিক মানের উৎসব পরিচালনায় এই প্রহসনের কী প্রয়োজন! আসলে, যোগ্য লোক না থাকলে যা হয়, তাই হচ্ছে। শুধু দুঃখ, কুড়ি বছরেও সাবালক হল না ভারতের চলচ্চিত্র উৎসব। নাবালকই থেকে গেল। তা না হলে এমন 'তামাশা' হয় উৎসব-উদ্বোধনী সন্ধ্যায়।

বিদেশের নামকরা চলচ্চিত্র উৎসবের মর্যাদা পেতে হলে যে শৃঙ্খলা, সংযম, নিষ্ঠা এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তা কি আমাদের উৎসব-কর্তৃপক্ষ একবারও ভেবে দেখেছেন? যদি দেখতেন তাহলে এমন 'হাস্যকর সার্কাসের ঘটনা' ঘটত না। যাই হোক, এখনও সময় আছে শুধরে নেবার। অভিজ্ঞ হবার। ভারতের চলচ্চিত্র উৎসবের মর্যাদা ও গৌরব সেদিনই বৃদ্ধি পাবে যেদিন বিশ্বের নামীপরিচালকেরা ভেনিস, বার্লিন, কান উৎসবে তাঁদের ছবি না পাঠিয়ে ভারতে পাঠাবেন। সেই যোগ্যতা অবশ্যই অর্জন করতে হবে যে কোন মূল্যে। তা যদি না হয় তবে ভারতীয় উৎসব থেকে প্রতিযোগিতা বিভাগটা তুলে দেওয়াই ভাল। লাখ লাখ টাকা খরচ করে ছেলেমানুষী করা কুড়ি বছরের উৎসবের পক্ষে শোভা পায় না। বরং শুধু দেশ-বিদেশের সেরা ছবির মেলা বসলে আমাদের ভারতীয় চলচ্চিত্র-নির্মাতা ও দর্শকরাই উপকৃত হবেন বেশি। এবং তা অবশ্যই যেখানে চলচ্চিত্র নির্মিত হয় সেখানে। যেমন কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজে। দিল্লি নয়। ভারতের রাজধানী দিল্লি হতে পারে, কিন্তু চলচ্চিত্রের নয়। চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত কেউ থাকেন না দিল্লিতে। তাঁরা থাকেন কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাইয়ে। তাই দিল্লির উৎসব চলচ্চিত্রের হয়ে ওঠে না। হয় শীতকালীন বিনোদন উৎসব। □

যদিও একটি দেশের আধুনিকতা ও উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি কলকারখানাই পরিবেশ দূষণ করে চলেছে, কিন্তু এটা দুর্ভাগ্য যে এই কলকারখানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজন অর্থাৎ শ্রমিক বা তাদের রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনগুলো পরিবেশ দূষণকে গুরুত্ব দিতে একেবারেই নারাজ। ব্যতিক্রম যা আছে তা ধর্তব্য নয়। পশ্চিমের দেশগুলোতে অতি-শিল্পায়নের জন্য দূষণের মাত্রাও খুব উঁচু, কিন্তু তবু সেখানে এই নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছে অনেক দিন। শুরু হয়েছে দূষণ বিরোধী যুদ্ধ। এখনও আমাদের কলকাতা শহর পৃথিবীর দূষিত শহরের তালিকায় তৃতীয়। তবে সবকিছু যেভাবে চলছে, এইভাবে চললে একদিন আমরা বিশ্বে এই ব্যাপারটাতে প্রথম স্থান অধিকার করবো।

শুভাশিস মৈত্র
বিশ্বজিৎ রায়

ভারতের মত গরীব দেশে বাতাস দূষণ নিয়ে ভাবনাকে অনেকে বিলাসিতা মনে করেন। অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও ঠিক তেমনি, অর্থাৎ বাতাস, জল বা এক কথায় দূষিত পরিবেশ সব থেকে বেশি ক্ষতি করে গরীব মানুষের। যেহেতু দূষণ জনিত রোগের চিকিৎসার ক্ষমতাও তাঁদের কম, বা পানীয় জল ফুটিয়ে খাওয়াটাও তাদের কাছে দারুণ খরচ সাপেক্ষ, যেহেতু কলকারখানার লাগোয়া বস্তি অঞ্চলগুলোতে বাস করেন তাঁরাই, ফলে এ রকমটা ঘটাই স্বাভাবিক। তাই পরিবেশ দূষণ নিয়ে গরীব দেশেরই মাথা ব্যাথা হওয়ার কথা অনেক বেশি। যদিও একটি দেশের আধুনিকতা ও উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি কলকারখানাই পরিবেশ দূষণ করে চলেছে, কিন্তু এটা দুর্ভাগ্য যে এই কলকারখানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজন অর্থাৎ শ্রমিক বা তাদের রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনগুলো পরিবেশ দূষণকে গুরুত্ব দিতে একেবারেই নারাজ। ব্যতিক্রম যা আছে তা ধর্তব্য নয়। পশ্চিমের দেশগুলোতে অতি-শিল্পায়নের জন্য দূষণের মাত্রাও খুব উঁচু, কিন্তু তবু সেখানে এই নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছে অনেক দিন। শুরু হয়েছে দূষণ বিরোধী যুদ্ধ। এখনও আমাদের কলকাতা শহর পৃথিবীর দূষিত শহরের তালিকায় তৃতীয়। তবে সবকিছু যেভাবে চলছে, এইভাবে চললে একদিন আমরা বিশ্বে এই ব্যাপারটাতে প্রথম স্থান অধিকার করবো।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার অবশ্য মন্ত্রী সভায় পরিবেশ দূষণ দপ্তর চালু করেছেন এবং আছেন পরিবেশ দূষণ মন্ত্রীও। কিন্তু বিস্তারিত অনুসন্ধানে জানা গেছে এই দপ্তর সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে পরিবেশ দূষণ বিষয়ে কোন সক্রিয় ভূমিকা নিতে।

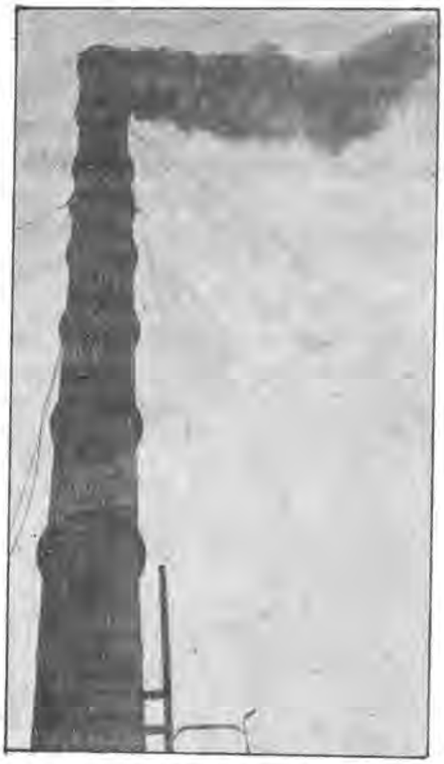

এছাড়া সরকারি অফিসাররা বাটা কোম্পানি সহ বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত বড়, মাঝারি, বা বিদেশি কোম্পানির বিরুদ্ধে পরিবেশ দূষণের অভিযোগে আদালতে যে সব অভিযোগ দায়ের করেছেন তার বেশির ভাগটাই শেষ পর্যন্ত তুলে নিতে হয়েছে নানান জটিল চাপের মুখে।

পলিউসন কন্ট্রল বোর্ড ঃ

এছাড়া পলিউসন কন্ট্রল বোর্ড, কিছু বিশেষজ্ঞ সজ্জিত যে অফিসটিকে কলকাতায় বসানো হয়েছে বছর চারেক হল তাদের অবস্থা আরোই করুণ। এবং কোনই কাজ না করে এক ভয়ঙ্কর গোপনীয়তার আবরণ তুলে নিজেদের এঁরা ঘিরে রেখেছেন। ল' অ্যাসিসট্যান্ট থেকে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রত্যেককেই, যখন আমরা প্রশ্ন করেছি, 'আপনারা কি ভাবে কাজ করেন' বা 'আপনাদের কাজের পদ্ধতি কি ?' এর উত্তরে সবাই গদগদ হাসি হেসে জানিয়েছেন, 'আমাদের কিছু বলবার অধিকার নেই, আপনি অমুকের কাছে যান'। এইভাবে অমুক এবং তমুকের কাছে লাট খেতে খেতে অবশেষে এই প্রতিবেদক হাজির হলেন এই বিভাগের মেম্বার সেক্রেটারি, অত্যন্ত সুদর্শন, অত্যান্ত উচ্চ শিক্ষিত সুধীর কুমার ভট্টাচার্য-র চেম্বারে। সব শুদ্ধু প্রায় পাঁচ-ছ'বার এই প্রতিবেদককে সুধীর বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হয়েছিল। প্রত্যেকবারই মুখ দেখামাত্র তিনি, 'এক মুহূর্ত সময় নেই, এক মাস পরে আসুন' এবং অসহযোগিতার সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ক্রমাগত বিরক্তি উৎপাদন করেই তাঁকে বাধ্য করা হয়েছে কথা বলতে। বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, ১. আমাদের এ বিষয়ে কিছু করবার নেই, ২. এটা আমি বলবো না, ৩. আমরা তো সবে কাজ শুরু করেছি, ৪ আমাদের ও রকম বিশেষজ্ঞ নেই, ৫. আমরা কি করতে পারি, ৬. আপনি এবারে আসুন আমার জরুরী কাজ আছে।

অবশ্যই ছ'দিনের প্রাণান্ত প্রচেষ্টার আরও কিছু তথ্য তিনি আমাদের দিয়েছেন। সেগুলো হল ১. শ'ওয়ালেস কোম্পানি হলদিয়াতে যে কীটনাশক ফ্যাক্টরি চালু করেছেন বছর তিনেক হল, তাদের এই উৎপাদন চালু করবার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি পত্র (Consent letter) এই পলিউসন কন্ট্রল বোর্ড থেকে পাননি। অর্থাৎ তাদের উৎপাদন পদ্ধতিতে দূষণ কমাবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে পলিউসন কন্ট্রল বোর্ড মনে করছেন না। তা সত্ত্বেও অবশ্য সেখানে কীটনাশক তৈরি

অব্যাহত আছে। কি ভাবে এমন একটি জরুরী অনুমতি বিনা এই উৎপাদন চালু রাখা হয়েছে তা রহস্য। এর উত্তর পলিউসন কন্ট্রল বোর্ড আমাদের দেননি। ক্লোরাইড ইন্ডিয়া বা এরকম আরো দু'একটি ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে এই পলিউসন কন্ট্রল বোর্ড আইনগত ব্যবস্থা নিতে চলেছেন। আদালতে এখন এই সব মামলা ঝুলে আছে। তবে মেম্বার সেক্রেটারি ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বাস করেন না এই সব মামলায় কোন কাজ হবে। এ রকম ক'টা মামলা আদালতে ঝুলছে তা জানাতে মেম্বার সেক্রেটারি অস্বীকার করেছেন। তবে এ বিষয়ে তাঁর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মত হল এ ধরণের মামলা পরিচালনা ও তার কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য একটি বিশেষ ট্রাইবুনাল প্রয়োজন।

'অফিসিয়াল সিক্রেসি' এই শব্দ দুটির ঢাকনা দিয়ে যাবতীয় তথ্য চেপে দেওয়ার একটি অপচেষ্টা সমস্ত সরকারি অফিসে দেখা যায়। কিন্তু বিষয়টি যখন পরিবেশ দূষণ এবং তা যখন দেশি বিদেশি এবং সরকারি কলকারখানা থেকে (স্টেটবাস বা কোলাঘাট বিদ্যুৎ প্রকল্প) এবং যেহেতু এর ফলে সরাসরি জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপন্ন তবে সে ক্ষেত্রে এই বিষয়ে তথ্য গোপন করবার অধিকার কতটা সমর্থন যোগ্য তা ভেবে দেখবার সময় এসেছে। বৃটিশ সরকারের তৈরি করা এই 'অফিসিয়াল সিক্রেসির' ব্যবস্থা কি গণতন্ত্রের সহায়ক, এ প্রশ্ন আজ ওঠা উচিত। □

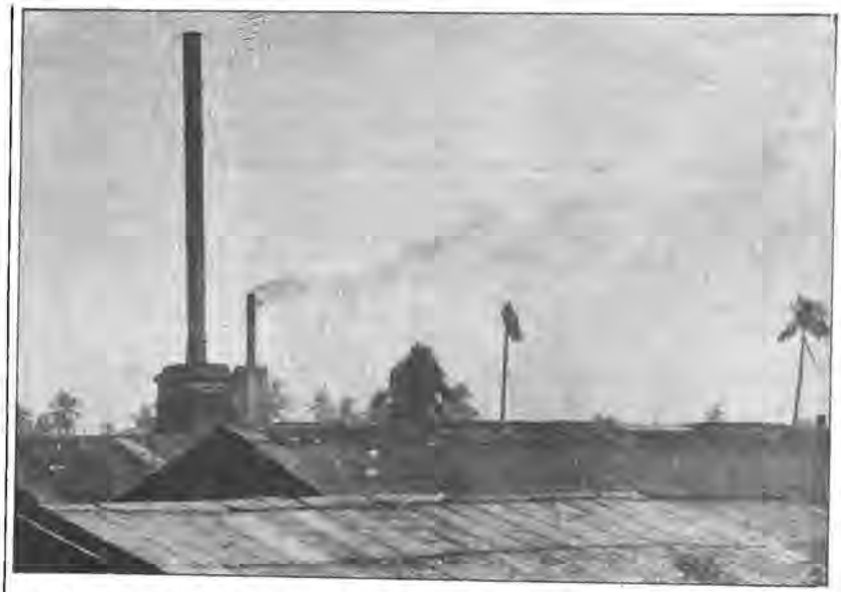

নিধিরাম সর্দারদের কথা

এ রাজ্যের পরিবেশের অভিভাবক সংস্থাগুলি আসলে নিধিরাম সর্দার। সাত হাজার কারখানাকে দেখার জন্যে চার জন মেডিকেল ইন্‌সপেক্টর থাকার কথা। তবে এ সংখ্যাটাও বোধ হয় সরকার বাহুল্য মনে করেন। তাই এখন আছেন সাকুল্যে একজন। সেই সবেধন নীলমণি ড: বি.কর মহাপাত্র জানালেন আমি নিজেই সালফার এবং ক্লোরিনের দ্বারা এ্যাটাকড। বেশ কিছুদিন চোখের রোগে ভুগেছি।' তিনি জানান ইনডাস্ট্রীয়াল হাইজিন এবং অকুপেসনল মেডিসিন্-এ বিশেষজ্ঞের অভাব দিন দিন বেড়ে চলেছে। জটিল কারিগরি সমস্যা এবং শিল্পায়নের অনিবার্যতার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ সংকটকে মোকাবিলা করার জন্যে প্রয়োজন বহুমুখী এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক তৎপরতা।

কারখানা পরিদর্শক দপ্তরে এখনও পর্যন্ত কোনও আধুনিক গবেষণাগার নেই। অভিযুক্ত কারখানার থেকে দূষিত জল বা বায়ুর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করার কথা এদেরই। "কিন্তু আমরা নিজেদের যন্ত্রপাতি না থাকায় ম্যানেজমেন্টের উপরই নির্ভর করি। তারা তা করে দেয় খুশিমত।" এর থেকে বিড়ালকে মাছ পাহারা দিতে বলা অনেক ভাল। পলিউসন বোর্ডের অধীন স্টেট ল্যাবরেটরিতে গ্যাস লিকুইড কন্ট্রোলারই নেই। এমন কি কোন টক্‌সিকোলজি বা বিষক্রিয়া সংক্রান্ত কোন বিভাগই নেই। যাদবপুরে স্টেট ওয়াটার ল্যাবরেটরিতে বছরে ১টা কি ২টো নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এতো গেল যন্ত্রপাতি না থাকার সমস্যা। কিন্তু যে আন্তরিক উদ্যোগ থাকলে এসব সত্ত্বেও দূষণ রোধের কাজটি এগোয় তার অভাব প্রকট। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ মেডিকেল রিসার্চ-এর অধীন বৃত্তিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা সংক্রান্ত একটি গবেষণাগার কলকাতায় আছে। এর অধিকর্তা ড: পরিমল গাঙগুলী আমাদের জানালেন বহু হাঁটাহাঁটি করেও তিনি এ রাজ্যে দূষণকারী বলে অভিযুক্ত কারখানাগুলির নাম এবং এফ্লুয়েন্ট সংক্রান্ত বিবরণ পাননি। উল্লেখযোগ্য আই. সি. এম. আর আমেদাবাদে যে অকুপেসনল ডিজিজ্ সংক্রান্ত গবেষণাগারটি চালান, তার খ্যাতি ভারত জোড়া। দূষণ প্রমাণে ও প্রতিরোধ পরিকল্পনায় অগ্রগণ্য এই সর্বাধুনিক সংস্থাটির সাহায্য নিয়ে ইতিমধ্যেই মধ্য প্রদেশ ও কেরল সরকার বহু বিপন্ন মানুষের ভোটের মূল্য দিয়েছেন। কিন্তু এ রাজ্যের পরিবেশ দপ্তর এবং তার শাখাগুলির কর্তা ব্যাক্তিরা বোধ হয় এই সম্ভাবনাটিকে নিয়ে মাথা ঘামাননি। সর্বস্তরেই সীমিত ক্ষমতার অজুহাত। অন্যদিকে এই সীমিত ক্ষমতা ব্যবহারেও নানা গলতি। এই পরিপ্রেক্ষিতে খড়দা পৌরসভার কমিশনার মলয় মুখার্জীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, "পলিউসন্ বোর্ডের লোকেরা আসার আগেই কি করে যেন কোম্পানীগুলো খবর পেয়ে যায়; সংগে সংগে তারা লিক্-টিক্ বন্ধ করে দেয়।" এহেন অবস্থায় চীফ্ ফ্যাক্টরী ইনস্‌পেক্টর রাজ্যের ৪২৩টি কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীর কাছে তাদের উৎপাদিত, ব্যবহৃত ও মজুতকৃত বিষাক্ত এবং ক্ষতিকারক পদার্থের বিবরণ চেয়ে পাঠালেও আশংকা হয়-শেষ পর্যন্ত বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো হয়ে যাবে না তো? □

শ ওয়ালেস কীটনাশক কোম্পানির বেআইনী কার্যকলাপ

পলিউসন কনট্রোল বোর্ডের মেম্বার সেক্রেটারি আমাদের জানিয়েছিলেন তাঁরা কলকাতা এবং তার আশপাশের বেশ কিছু দেশি ও বিদেশি কেমিক্যাল ও কীটনাশক কোম্পানিকে উৎপাদনের অনুমতি দেননি। বা, আগে দেওয়া হয়েছিল এরকম বেশ কিছু কোম্পানির অনুমতিপত্র তুলে নেওয়া হয়েছে। যদিও এইভাবে অনুমতিপত্র বাতিল হওয়া কোম্পানির তালিকা মেম্বার সেক্রেটারি আমাদের দেননি। তবে কথা-প্রসঙ্গে জানা গেছে গত তিন বছর ধরে চালু থাকা হলদিয়ায় শওয়ালেসের কীটনাশক শাখাকে পলিউসন কনট্রল বোর্ড কোনদিনই কনসেন্ট লেটার অর্থাৎ অনুমতি-পত্র দেননি। এছাড়া অনুমতি পত্র তুলে নেওয়া হয়েছে যে কোম্পানিগুলো থেকে তার ভেতর

অন্যতম হল টাটা ফিসন, অ্যালকেলি কেমিক্যাল, রিষড়া, এবং খড়দহর একটি রাসায়নিক ফ্যাকটরি।

শওয়ালেস কতৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা অবশ্য সরাসরি এটা অস্বীকার করেছেন, যদিও বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর নেবার পর আমাদের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই কোম্পানিটিকে কোনদিনই বোর্ড উৎপাদনের অনুমতিপত্র দেননি। অবশ্য কলকাতার ন্যাশন্যাল এনভায়ারমেন্টাল ইনস্টিটিউট সংক্ষেপে নিরি–র সাইনটিস্ট ডাইরেকটর এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন শওয়ালেস থেকে জনৈক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে আনঅফিসিয়ালি দেখা করে কি ভাবে বর্জ্য পদার্থ ট্রিটমেন্ট করা সম্ভব এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিলেন। অন্যদিকে ডেপুটি চিফ ফ্যাকটরি ইনসপেকটার (পশ্চিমবঙ্গ) এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, তিনি শওয়ালেসের কীটনাশক ফ্যাকটরিটি পরিদর্শন করেছেন, এবং তাঁর মতে এই কোম্পানিটির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আসলে এই বিষয়টি থেকে একটা জিনিসই পরিষ্কার হয়ে ওঠে তা হল, পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরগুলো, ফ্যাকটরি সংক্রান্ত দপ্তর-গুলো এবং কেন্দ্রের পলিউসন কনট্রল বোর্ডের মধ্যে কোন রকম কোঅরডিনেশন নেই।

শওয়ালেস যে ধরনের কীটনাশক তৈরি করে তাকে বলা হয় অরগানো–ফসফরাস কমপাউন্ড। এই ধরনের যৌগগুলো প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাবার পর বাতাসে ধীরে ধীরে ভেঙে বিভিন্ন ধরনের কম ক্ষতিকারক যৌগে পরিণত হয়। তা সত্ত্বেও এই ফ্যাক্টরিতে যে ধরনের রাসায়নিক পদার্থ প্রতিনিয়ত ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে বেশ কিছু মারাত্মক ক্ষতি-কারক। যেহেতু কর্তৃপক্ষ ক্ষতিকারক বর্জ্য পদার্থ দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে জলে ছেড়ে দিচ্ছেন ফলে এখানকার কর্মচারিদের দিয়ে এখানে কিভাবে ও কতটা আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক ভাবে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থগুলো নাড়াচাড়া করানো হয় এ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান অবশ্যই হওয়া উচিত।

যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ শওয়ালেসে ব্যবহৃত হয় ও মানুষের শরীরে তার প্রভাব

১. এপিক্লোর হাইড্রিন–এই যৌগটি কারসেনজনিক অর্থাৎ এ থেকে ক্যানসার হবার সম্ভাবনা আছে। জীবকোষের ডি. এন. এ.-র উপর এই যৌগ প্রভাব ফেলতে এবং জেনেটিক কোডের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম।

২. মনোক্লোর অ্যাসেটিক এসিড–এই যৌগটি মানুষের চামড়ার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

৩. বেনজিন–গায়ের চামড়ার মধ্যে দিয়ে শরীরে প্রবেশ করতে পারে একটি বিশেষ মাত্রায় নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে প্রবেশ করলে (১০০ পি. পি. এম.) টক্সিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নানান দিক থেকে এই যৌগটি শরীরের ক্ষতি করে। কখনও কখনও এর থেকে লিউকোমিয়া দেখা দিতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

৪. ডাইমেথিয়ন এবং এথিয়ন

এই দুটো কীটনাশকই অরগানো ফসফরাস যৌগ। দীর্ঘ সময়ে এরা এসটেরাস বলে একটি এনজাইম-এর সাধারণ কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। অ্যাসিটাইল কোলিন বলে যে যৌগ

আমাদের স্নায়ুতন্ত্র ও মেটাবলিজমের প্রধান আধার সেগুলোকে অকেজো করে দিতে পারে এই যৌগগুলো। এবং এর ফলে দীর্ঘ সময় বাদে প্যারালাইসিস দেখা দিতে পারে। □

শ-ওয়ালেসের সদর দপ্তর

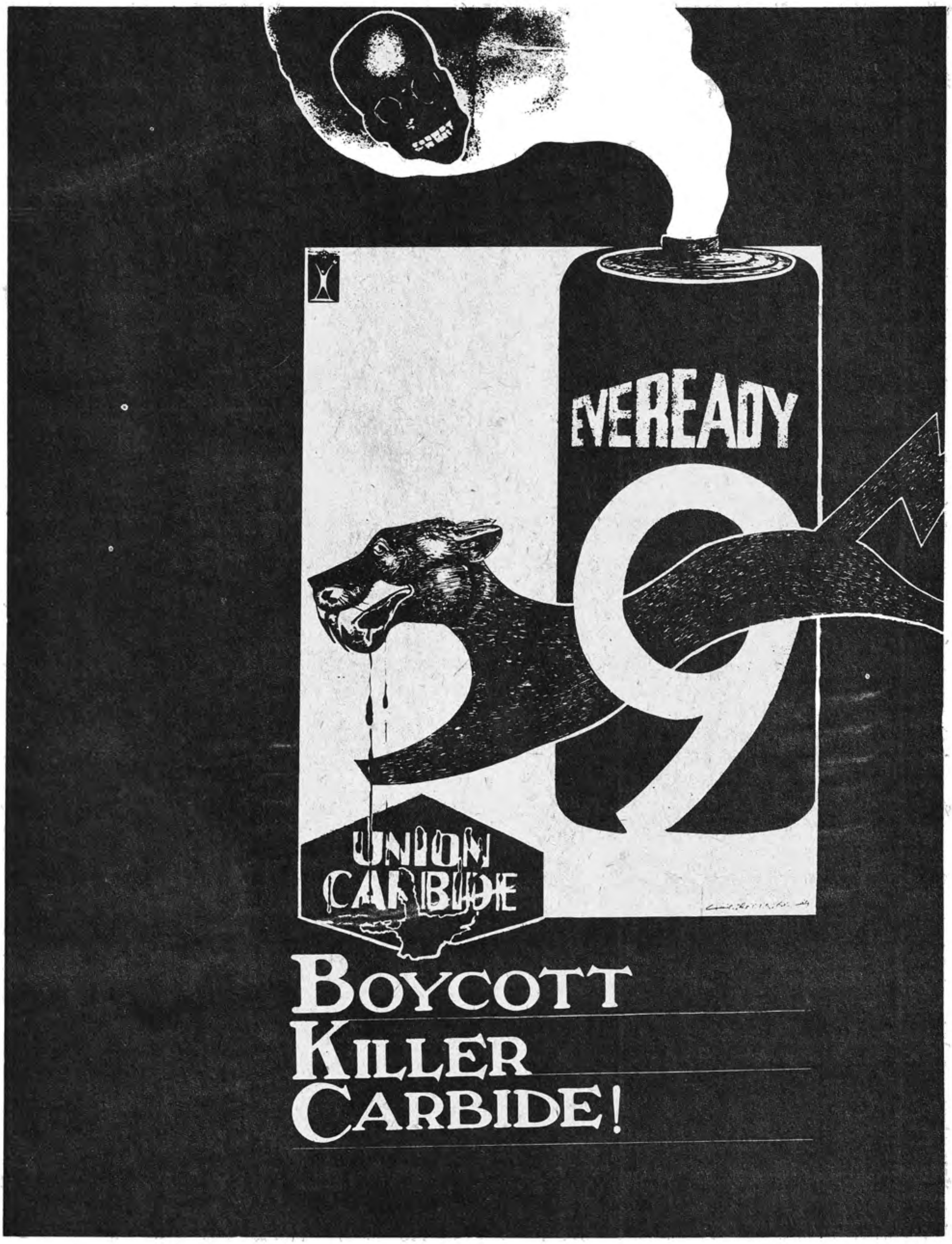
EVEREADY
9
UNION
CARBIDE
BOYCOTT
KILLER
CARBIDE!

হিন্দুস্থান লিভার ও বিড়লার রেয়ন কারখানার কাহিনী

'এই কারখানায় ব্যবহৃত হয় বিষাক্ত ওলিয়াম গ্যাস' জানালেন ফ্যাক্টরী দপ্তরেরই এক বড়কর্তা। এছাড়া মারাত্মকরকম অব্যবস্থা রয়েছে ব্যাচিং পদ্ধতিতে। এখানে জলকে তড়িৎ বিশ্লেষিত করে প্রাপ্ত হাইড্রোজেন গ্যাস উচ্চচাপে ব্যারেলে ধরে রাখা হয়। কিন্তু একটি ব্যারেল ভর্তি হওয়ার পর অপর একটি ব্যারেলে গ্যাস যাওয়ার পথে যে চাপনিয়ন্ত্রক ভাল্ভগুলি আছে তা যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় মারাত্মক বিপদের সম্ভাবনা আছে। উচ্চচাপযুক্ত এই হাইড্রোজেন গ্যাস দারুণ বিস্ফোরক। সামান্য এধার ওধার হলে গোটা এলাকা জ্বলে যেতে পারে—জানালেন শিল্প দপ্তরের জনৈক পরিদর্শক। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ওয়ার্কস ম্যানেজার জানান, 'সর্বত্রই তো এরকম হয়ে থাকে।' এসব সত্ত্বেও এই কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। তার কারণ বোধহয় কানাডীয় বহুজাতিক ইউনিলিভারের এই ভারতীয় সংস্করণটির মুরুব্বীদের কব্জির জোর।

কেশোরাম রেয়ন

বিড়লার রেয়নজাল ছড়িয়ে আছে সারা ভারতে। মধ্যপ্রদেশের নাগদাস্থিত কৃত্রিম তন্তু উৎপাদক কারখানাটির মত তার হুগলীর যমজটিও দেশের দূষণচিত্রে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এ নিয়ে কাগজে অনেক লেখালেখিও হয়েছে। বছরের পর বছর কার্বনডাইসালফাইড গ্যাস ছেড়ে এই কারখানা কুন্তীঘাট এলাকার হাজার হাজার মানুষের শ্বাসবায়ু বিষিয়ে চলেছে। বাতাসের তুলনায় ভারী এই গ্যাস এক রাতে বহু মানুষকে খারিজ না করে দিলেও ক্রমাগত অন্তর্ঘাত চালায় স্নায়ুতে, ফুসফুসে, মস্তিষ্কে। বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় দেখা গেছে স্মৃতিভ্রম, যৌনক্ষমতা হ্রাস, অনুভূতি কমে যাওয়া থেকে শুরু করে পক্ষাঘাত, দৃষ্টিহীনতা এবং বিভিন্ন মানসিকরোগ দেখা দেয়। এছাড়া এই কারখানার থেকে দূষিত জল বেরিয়ে প্রতিদিন হুগলি নদীকে বিষিয়ে তুলছে।

এর বিরুদ্ধে ৬৭ সালে গড়ে ওঠে স্থানীয় নাগরিকদের উদ্যোগে গ্যাস রেসিস্টেন্স কমিটি। এদের চাপের সম্মুখীন হয়ে কোম্পানী দূষণের অভিযোগ স্বীকার করে। কিন্তু শোচনীয় বেকারত্ব এবং দারিদ্রের সুযোগে নেহাত ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাদের আদত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কমিটির সংগে চুক্তিতে ঠিক হয়েছিল প্রয়োজনীয় পরিমাণে কার্বনডাই-সালফাইড উৎপাদন করা হবে। কিন্তু কার্যত উৎপাদন হচ্ছে ঢের বেশী। এছাড়া অবাধে নির্গত হচ্ছে সালফিউরিক এ্যাসিড। '১৭ টন রেয়ন উৎপাদনে ৬০ টন এ্যাসিড লাগে একথা একমাত্র কোম্পানী পক্ষ ছাড়া আর কেউ বলবে না।' এক বিশেষজ্ঞের মন্তব্য। আসলে বাড়তি এ্যাসিড উৎপাদন করা হচ্ছে বাড়তি মুনাফার স্বার্থে। তা করুন আপত্তি নেই, কিন্তু তার সাথে ক্রমাগত দূষণ তো বরদাস্ত করা যায় না। সালফিউরিক এ্যাসিড প্ল্যান্ট থেকে কস্টিক মিশ্রিত জল গিয়ে পড়ছে গঙ্গায়। এর ফলে আক্রান্ত হচ্ছে মাছ মানুষ এবং ফসল। সামান্য লাইম ব্যবহার করে এই জলকে দূষণমুক্ত করে তোলা যায়। লোকজন হৈ চৈ করলে কিছুদিনের জন্যে এ্যাসিড লিকেজ্ বন্ধ হয় এবং জলে লাইম দেওয়া হয় বটে। কিন্তু তারপর অবস্থা সেই একই দাঁড়ায়। অন্যদিকে কেশোরাম কতটা এ্যাসিড উৎপাদন করবে, "এটা আমাদের দেখার কথা নয়।" জানালেন ফ্যাক্টরী ইনস্পেক্টর "তবে এবার দেখব।" রেয়নের উৎপাদনে প্রয়োজনীয় নানা রাসায়নিক মিশ্রিত মন্ডটিকে যথাক্রমে কস্টিক সোডা, এবং সালফিউরিক এ্যাসিডের মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয়। ব্যবহৃত সি এস্ টু বিক্রিয়ার ফলে উচ্চ চাপের সৃষ্টি করে গ্যাসে পরিণত হয়। এমনিতেই এই গ্যাস প্রচন্ড বিস্ফোরক। ফলে চাপ বেড়ে গেলেই কারখানার ভিতরে বিপদ এড়াতে কোম্পানী একে চিমনী দিয়ে বাইরে ছেড়ে দেয়। এই বিষাক্ত গ্যাস কি ধরনের ক্ষতি করে তা আমরা আগেই জানিয়েছি। অথচ সামান্য বিনিয়োগ করলেই এই গ্যাসকে তরলে রূপান্তরিত করে তাকে কাজে লাগানো যায়। পলিউসান বোর্ডের পক্ষ থেকে এর জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রের ডিজাইনও করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোম্পানী তা কাজে লাগায়নি। ফলে শুধু স্থানীয় মানুষ নয়, শ্রমিকরাও প্রতিদিন মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। বেশ কিছু শ্রমিক গত কয়েক বছরে মারাও গেছেন। মুন্দ্রিকা সিং মঙ্কেশ্বর প্রসাদ, রাম প্রকট শুক্লা। নিমাই পন্ডিত, সুশীল প্রামাণিক ও চন্দ্রিকা যাদব এদেরই কয়েকজনের নাম। "প্রায়ই রেয়নে লোক মারা যায়।" জানালেন বোর্ড সেক্রেটারি। [illegible]

বিষাক্ত ধোঁয়া, সংযোগরক্ষাকারী খালে পড়ছে 'কস্টিক স্লাড'।

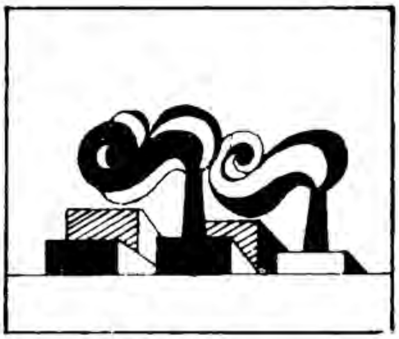

রিষড়া

অ্যালকালি কেমিক্যাল ওরফে ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভ্ কারখানার প্রহরী সমেত দরজা পেরিয়ে ঢুকলেই মনে হবে যেন প্রথম বিশ্বের কোন গবেষণাগারে ঢুকে পড়েছি। গেটের সামনেই ফলক ঘোষণা করছে এখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে। অতএব নিরাপত্তামূলক সমস্ত ব্যবস্থা মেনে চলুন। মসৃণ অ্যাসফাল্টের রাস্তার বিভিন্ন কোণে সতর্কবাণী আরও বিশদ এবং শাসানিমূলকঃ "এখানে ধূমপান করিলে তৎক্ষণাৎ চাকরী যাইবে"। মোড়ে মোড়ে আরও অনেক সাবধানতা, আগুন নেভানোর সর্বাধুনিক ব্যবস্থাসহ। এহেন রঙীন নিরাপত্তাময় পরিবেশে মার্কিনী বহুজাতিক আই. সি. আই.-এর এই শাখাটিকে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ মালুম হয়। "আমাদের এখানে আগুন লাগা সম্পর্কে ম্যানেজমেন্ট খুব সচেতন", জানালেন একজন কর্মী। কিন্তু এই চমকপ্রদ উদারতার আড়ালে এখান থেকেই প্রতিদিন রিষড়ার জলে এবং বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর বিষাক্ত ফোর অ্যামিনো ডাই-ফিনাইল গ্যাস এবং বিভিন্ন অ্যামিনো যৌগ অপরিশোধিত অবস্থায়। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন শ্রমিক ক্যান্সারে মারা গেছেন।

মিক্ বা ফসজিনের কায়দায় একরাত্রে কয়েকহাজার মানুষকে হাপিস করার মত চাঞ্চল্যকর যোগ্যতা না থাকলেও প্রথম গ্যাসটি ক্যানসার ও লিউকোমিয়া ডেকে আনতে পারে। অ্যামিনো যৌগগুলি (ডাই-ফিনাইল অ্যামিন, মর্সোলিন – ইত্যাদি) এছাড়াও দুরারোগ্য রক্তাল্পতাসহ হাড়ের বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। এমনকি এতে হাড়ের ভিতরকার মজ্জাও শুকিয়ে ফেলে। গ্যাস অথবা তরল যে কোন রূপেই হোক না কেন এই সব যৌগগুলো তৈরী হয় বেন্জিন্ জাতীয় অ্যানিলিন্ থেকে। এই অ্যানিলিন্ থেকে যখন রাবার শিল্পে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রাসায়নিক উৎপাদন করা হয় তখন ডাই-ফিনাইল অ্যামিন প্ল্যান্টে উপজাত হিসাবে উৎপন্ন হয় ফোর অ্যামিনো ডাই-ফিনাইল, টারের মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায়। আগে এই বিষাক্ত টার ব্যারেল বন্দী অবস্থায় সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আসা হত। এখন তা নিষিদ্ধ হওয়ায় একে পুড়িয়ে ফেলার কথা। নিয়মমত পোড়ালে চিমনি দিয়ে কোন কালো ধোঁয়া বেরোবে না অর্থাৎ সমস্ত সঞ্চিত কার্বন পুড়ে গিয়ে উজ্জ্বল শিখা দেখা যাবে। কিন্তু ম্যানেজমেন্টের গাফিলতিতে এই বিশেষ ট্রিট্মেন্ট প্ল্যান্টটিতে প্রায়ই দেখা যায় চিমনি উগ্‌রে দিচ্ছে কালো ধোঁয়া। শিল্পাঞ্চলের নিঃসর্গে এই ধোঁয়াকে আটপৌরে মনে করলেও আসলে তা ঘোষণা করছে ক্যানসারের দিগ্বিজয়। রোজ প্রতি ২০০ কেজি টারে ২ কেজি ফোর-অ্যামিনো-ডাই-ফিনাইল বাতাসে মিশে যাচ্ছে। অ্যামিনো

যৌগগুলো ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে শুধুমাত্র কস্টিক ব্যবহৃত হওয়ায় অপরিশোধিত থেকে যায়। এদের উপযুক্ত শোধনের জন্য দরকার জটিল জীবানুঘটিত বিক্রিয়া। এরজন্যে যে পরিমাণ বিনিয়োগ দরকার বহুজাতিকের পক্ষে তা সাধ্যাতীত নয়। কিন্তু মানবকল্যাণখাতে অন্যান্য ব্যয়ের মত এটিতে 'রিটার্ন' না থাকায় সাহেবরা এবং তাদের এদেশীয় প্রতিনিধিরা কোন ব্যবস্থা নেন্‌নি। বদলে কালেভদ্রে সরকারী ইন্সপেক্টার এলে বেশী মাত্রায় জল ছেড়ে অ্যামিনো যৌগের আনুপাতিক ভাগ কমিয়ে দেন। কিন্তু কারখানার পেছনেই বাগখালে গেলেই দেখা যাবে জলের উপর ভাসছে নানা রঙের কেমিক্যাল। এরমধ্যে একটি বড় অংশই যায় কোম্পানীর প্রেস্ ডিভিশনের নর্দমা থেকে বিষাক্ত ক্রোমিয়াম সল্ট, লেড-অক্সাইড কার্বনেট এবং ন্যাপথিনেট্ সামান্য কস্টিকের বুড়ী ছুঁয়ে পড়ছে জলে। কোম্পানীর পলিথিন প্ল্যান্টে ব্যবহার করা হয় অ্যাক্রিলডিহাইড নামে আরেকটি বিষাক্ত যৌগ। শুধুমাত্র রাবার কেমিক্যাল প্ল্যান্ট থেকেই প্রতিদিন এক লক্ষ লিটার বিষাক্ত বর্জ তরল বাগখালে ছাড়া হয়। কোন রকম শোধন ছাড়াই (প্রতিদিন একলক্ষ কুড়ি হাজার লিটার ব্যবহৃত) এটার একটি বড় অংশই বাষ্পাকারে ছেড়ে দেওয়া হয় বাতাসে। কোম্পানীর ল্যাবরেটরীতে প্রতিদিন ব্যবহার করা হয় বিষাক্ত এবং বিস্ফোরক বেনজিন্, টলুইন, মিথাইলক্লোরোফর্ম এবং টেট্রাহাইড্রোফিউরান্। বলা বাহুল্য কোন শোধন ছাড়াই এগুলো বাইরে ছাড়া হয়।

অ্যালকালি কেমিক্যালের যে সব কর্মীরা গত ৬–৭ বৎসরে ক্যানসারে মারা গেছেন

১। আদিত্য দেবনাথ (রাবার কেমিক্যাল প্ল্যান্ট)

২। এ, রায়চৌধুরী (বর্তমানে অবলুপ্ত পাওয়ার হাউস)

৩। এইচ, রায় (বর্তমানে অবলুপ্ত পাওয়ার হাউস)

৪। মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ (ক্লোরিন অফিস)

৫ সুধীর দেব (ডি, পি, এ, প্ল্যান্ট)

ফ্যাক্টরী অ্যাক্টের নিয়ম অনুযায়ী এইসব রাসায়নিক ব্যবহারকারী কারখানায় অন্তত প্রতি ছ'মাস অন্তর শ্রমিকদের ডাক্তারী চেক্‌আপ করানোর কথা। কিন্তু গত দশ বছর ধরে তা শিকেয় তোলা আছে। একমাত্র এম. বি. টি. প্ল্যান্ট ছাড়া আর সর্বত্রই ব্যাচিং যন্ত্রের সাহায্যে করা হয় না। এর ফলে উচ্চ চাপে রাখা বিভিন্ন বিস্ফোরক ও বিষাক্ত পদার্থ–সামান্য ভুলচুকে বাইরে বেড়িয়ে পড়ে দ্বিতীয় ভূপাল ঘটাতে পারে বলে প্রবীণ কর্মীদের অভিযোগ। দুর্ঘটনা যে ঘটেনি এমন নয়। কিছুদিন আগে অ্যানিলিন্ ঘষাঘাটির পর সেইহাতে খৈনী টেপায় তা খেয়ে একজন শ্রমিক মারা যান। বিশেষ করে ক্যাজুয়াল লেবারদের বিপদ সবচেয়ে বেশী। তুলনামূলকভাবে নিরাপদ পেইন্টস ডিভিশনেও বিষাক্ত লেড্‌পিগ্‌মেন্ট–এর বস্তা খালাসকারী শ্রমিকদের সারা গায়ে মুখে সীসার গুঁড়ো ঝরে পড়তে এই প্রতিবেদক স্বচক্ষে দেখেছেন। সরকারী লেড্ বা

সীসাদূষণ পয়লা নম্বর পেশীজনিত রোগ বলে স্বীকৃত । কিন্তু তাতে কোম্পানীর কিইবা এসে যায়। ভূপালে মিক্ বা ফস্জিন্ 'লিক' করার আগে কেউ জানত না সেখানে উৎপাদন বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ঐ মৃত্যুদূতদের সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সম্ভবতঃ এই মহান ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তাল মেলাতেই এই রাজ্যের ডজনখানেক সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার কেউ জানেন না অ্যালকালি কেমিক্যাল কতটা বেনজিন, অ্যানিলিন, ক্লোরিন মজুত করে রেখেছে। উপযুক্ত নজরদারী না থাকায় ক্লোরিন রিজার্ভারে লিক হয়ে বড় বিপদ ঘটাতে পারে। উল্লেখযোগ্য কয়েকবছর আগে এরকম একটি দুর্ঘটনা ঘটেই এলাকায় বহু মানুষকে অসুস্থ করে তুলেছিল।

স্থানীয় প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ নারায়ণ ব্যানার্জী জানালেন তিনি যখন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তখন অ্যালকালি এবং পার্শ্ববর্তী ফসফেট ফ্যাক্টরীকে দূষণরোধের ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন। বর্তমান অধিক ক্ষমতাশীল পৌরসভাও তা করেছে । কিন্তু দুই ম্যানেজমেন্টই তাতে কর্ণপাত করেনি। ক্যানসারের প্রকোপ এ অঞ্চলের তুলনায় বেশী কিনা বা তাতে অ্যালকালির দায়িত্ব এ নিয়ে সরকারের কাছে অবিলম্বে সমীক্ষা করার দাবী জানালেন তিনি। অ্যালকালির এমারজেন্সী ডাক্তার স্নেহাংশু ব্যানার্জী জানালেন মাসে অন্ততঃ তিন চারটে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এর মধ্যে বেশীর ভাগই চোখে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ পড়ার ঘটনা। দুজনেই একমত এ অঞ্চলে শ্বাসকষ্টজনিত বিভিন্ন রোগের প্রকোপ বেড়ে গেছে। তবে ক্যানসারের প্রকোপ বৃদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ উঠলেও সরকারী বা কোম্পানী তরফে কোন সমীক্ষা দূরে থাক সামান্য বিবৃতিটুকুও দেওয়া হয়নি।□

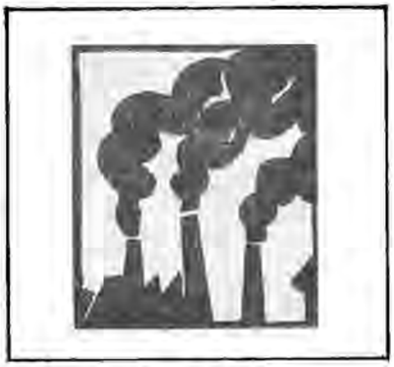

সোদপুর–খড়দহ–টিটাগড়

শুরুতে এই শিল্পাঞ্চলের বাতাসে এবং জলে দূষণ তথা বিষক্রিয়ার বিশদ বিবরণ না দিয়ে এখানে পেশ করছি কয়েকটি চিঠি। এটি চিফ্ ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টর লিখেছেন রাজ্যের শিল্প অধিকর্তাকে। "হিন্দুস্থান হেভি কেমিক্যাল, জয়শ্রী কেমিক্যাল, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি কারখানাগুলোর ক্লোরিন, অ্যালকেলি এবং অ্যাসিড উৎপাদক প্ল্যান্টের কল্যাণে এই অঞ্চলে ব্যাপক বায়ু দূষণ চলেছে। দূষণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা ছাড়াই এলোপাথাড়ি কারখানা বসানোর ফলেই আজ এই পরিবেশ সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।...." রেফারেন্স নং – ২৫৪/ ৩১৭-৭৯/ ৮০ পি. এ. এই চিঠিতে আরও জানা যায় কারখানা বসানোর আগে ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টরের পরামর্শ নেওয়া হয়নি। সরকারি অভিধানে যদি 'সংকট' শব্দটির কোন মামুলি অর্থ না থেকে থাকে তবে আমরা ধরে নিতে পারি ২৭-৫-৮০ তে লেখা এই চিঠি চাপাটির পর লালফিতের ফাঁস থেকে মুক্তি পাবে যাবতীয় তৎপরতা।কিন্তু পরিবর্তে দেখা যায় খড়দহ-টিটাগড় পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ সংস্থার চিঠির জবাব আসে পরিবেশ দপ্তর থেকে প্রায় একমাস বাদে। শুকনো প্রতিশ্রুতি ছাড়া তাতে আর কিছু নেই। এমনকি ভূপালের ঘটনার পর মহাকরণের টনক নড়লেও বর্তমান চিফ্ ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টর এই প্রতিবেদকের কাছে জানতে চান "জয়শ্রীর ওখানে ওয়াটার পলিউশন হচ্ছে নাকি ? যদিও তারই এক ডেপুটি জানালেন জয়শ্রী এবং হেভী কেমিক্যালের বিরুদ্ধে কেস চলছে। জয়শ্রীর ম্যানেজমেন্ট স্থানীয় দূষণবিরোধী সমিতির সঙ্গে আলোচনায় বসলেও হেভি এবং সি. এস. সি. কর্তৃপক্ষ তাদের চিঠির জবাব দেননি।

এন. পি.

হেভি, জয়শ্রী এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল বাতাসে ছাড়ছে সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং জলে মেশাচ্ছে কস্টিক, অ্যাসিড; অ্যালাম্ মাত্। হেভির ক্ষেত্রে ক্লোরিণ লিক্ও একটি নিয়মিত ঘটনা। নিঃসন্দেহে সালফার-ডাই-অক্সাইড একটি ঘাতক গ্যাস নয়। কিন্তু এটা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি জাতীয় শ্বাসকষ্ট জনিত রোগ তিলতিল করে কঠিন হার্টের অসুখের দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল গ্যাস যখন বেরিয়ে আসে তখন চোখে লঙ্কা পড়ার মত জ্বালা আর শ্বাস কষ্টে প্রাণ বেরোনোর উপক্রম হয়। বাড়ী ঘরের দরজা জানলায় জং ধরে থালা বাসনে পর্যন্ত দাগ ধরে যায়। সারাদিনই বাড়ীর দরজা-জানালা, বিছানা-পত্রে 'সালফার ছাই-এর পুরু আস্তরণ জমে থাকে জয়শ্রীর পাশের নালা দিয়ে গঙ্গায় গিয়ে পড়ছে কষ্টিক অ্যাসিড ও অন্যান্য রাসায়নিক মিশ্রিত জল। গঙ্গার মাছ শুধু নয়, হাঁস-মুরগী-কুকুর ছাগলও সে জল খেয়ে মারা যায়। চাষের ক্ষেতে এই জল পড়ে প্রায়ই ফসল নষ্ট করে। স্থানীয় প্রবীন অধিবাসী এবং ডাক্তার এল. এন. পাত্র জানালেন একের পর এক বাগান নষ্ট হয়ে গেছে। গঙ্গার পাশের জমি অথচ এখন এখানে স্কুলও হয় না। এদিকে কাশির ওষুধ লিখে লিখে হয়রান। ৭৫ ভাগ রোগীরই টি. বি. বা অ্যাজমা জাতীয় রোগ। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের টিটাগড় শাখার সম্পাদক ডাঃ এস. কে. ভট্টাচার্য জানালেন এখানকার বায়ুদূষণ বিপজ্জনক মাত্রা ছাপিয়ে উঠছে। এক সপ্তাহে মারা গেছেন তাঁর চিকিৎসাধীন ৭ জন রুগী। তার মধ্যে ৩ জনই হাঁপানির শিকার। কিছুদিন আগে হেভি কেমিক্যালসের একজন শ্রমিক মারা যান ক্লোরিণ প্লান্ট লিক করে। কোম্পানি ব্যাপারটা চেপে যেতে চেয়েছিল। জয়শ্রী এবং সি. ই. এস. সি. র টিটাগড় থার্মাল পাওয়ার প্লান্টের মাঝখানে মিলনগড় কলোনী। সেখানে শেফালি পোদ্দার (২৫), শংকর পোদ্দার (৩০), কালিপদ দাস (৪০) এরকম আরও অনেকেই অল্প বয়সে হাঁপানিতে আক্রান্ত। এ রকম ঘরে ঘরে। নাক ঝাড়লেই কাদা কাদা। তার উপর কারখানার পেছনেই পোড়ানো হচ্ছে কাঁচা কয়লা। ধোঁয়ায় কলোনী ঢেকে আছে। সি. ই. এস. সি. বিদ্যুতের থেকে বেশি উৎপাদন করে ধূলো। ফ্লাইং অ্যাস বলে পরিচিত এই কেমিক্যাল মিশ্রিত কয়লার গুঁড়ো অ্যাস বলে

সি. ই. সির পাশ্ববর্তী শ্রমিক কলোনী।

পরিচিত এই কেমিক্যাল মিশ্রিত কয়লার গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ছে গোটা বি. টি. রোডের দুধারে। উল্লেখযোগ্য প্রতিদিন প্রায় ৬০-৭০ লরী গুঁড়ো বেরোয়। এটা ত্রিপল ঢাকা লরীতে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম। কিন্তু ঠিকেদারী তো আর জনস্বাস্থ্যেরও ঠিকে নেয়নি! পাওয়ার প্ল্যান্টের আসল ক্ষমতা মালুম হয় কানে তালা লাগানো গর্জনে। হঠাৎ যখন এই আওয়াজ শুরু হয় তখন বৃদ্ধ বা রোগীরা তো বটেই, যুবকেরাও এলাকা ছেড়ে পালাতে চান।

চিফ্ ফ্যাক্টরী ইনসপেক্টর হেভি কেমিক্যালস কর্তৃপক্ষকে লিখেছিলেন "খড়দহ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সহ এলাকার সাধারণ মানুষের অভিযোগ তদন্ত করে আমরা দেখেছি দূষণ রোধে সে যে ব্যবস্থা আপনারা নিয়েছেন তা চূড়ান্তভাবে অপর্যাপ্ত। এর ফলে এলাকার মানুষ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে।...." ২১২০/৩১৭-৭৯/৮০ পি. এ. ব্যবস্থা বলতে কর্তৃপক্ষ চিমনীর উচ্চতা দশ ফুট বাড়িয়েছেন মাত্র। এদিকে দশ লাখ টাকার লাইমবেড পড়ে আছে। অথচ ক্লোরিণ এবং অ্যাসিড মিশ্রিত জল অপরিশোধিত অবস্থায় বেরিয়ে পড়ছে গঙ্গায়। উল্লেখযোগ্য কর্তৃপক্ষ ওয়াটার পলিউশন্ বোর্ডকে লেখে "আমরা দূষণ রোধে বিধিবদ্ধ যাবতীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। আমাদের ক্লোরিণ-কস্টিক প্ল্যান্ট থেকে যে বর্জ্য পদার্থ (এফ্লুয়েন্ট) বেরোচ্ছে তা আপনাদের স্থিরীকৃত বিপদ সীমার মধ্যেই থাকবে। সুতরাং আমরা আশা করি আপান আমাদের নতুন প্ল্যান্ট বসানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অনুমতি দেবেন।" যদিও এই একই চিঠির শুরুতেই তারা জানিয়েছেন "অনুগ্রহ করে আমাদের শীঘ্র জানান কি পরিমাণ শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থ মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেনে ফেলা যাবে।"

এ যেন ঘোড়ার আগে গাড়ী জোড়া। বলা বাহুল্য বোর্ড তাদের পারমিশন দেয়নি। এমন কি জয়শ্রীকেও নয়। জানালেন মেম্বার-সেক্রেটারী শ্রী ভট্টাচার্য। মিউনিসিপালিটিও নারাজ। কিন্তু তাতে এ দুটি কারখানার মালিক বিড়লার কিবা এসে যায়। জয়শ্রীর ম্যানেজার আর. জি. শর্মা অবশ্য বিবেচনা সম্পন্ন মানুষ, স্থানীয় দূষণ বিরোধী সমিতির সঙ্গে আলোচনায় তিনি বলেন, 'আমাদের সব কিছুই করতে হবে ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। বিদেশের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি তবে তাতে বিশেষ লাভ নেই। আসলে সর্বাগ্রে বিচার্য দুপক্ষেরই সমস্যার সমাধান।' তিনি আরও জানান নতুন প্ল্যান্ট হলে দূষণ কমে যাবে। তবে বছরে একবার দু'বার গ্যাস লিক হতেই পারে। কিছু গাছপালারও ক্ষতি হতে পারে। তা আর কি করা যাবে। কেননা যান্ত্রিক গোলযোগের ফলে দুর্ঘটনা হলে তো আর কিছু করার নেই। পাঠক নিশ্চয় এই বক্তব্যকে সমস্ত অভিযুক্ত কারখানা গুলোর ম্যানেজমেন্টের 'প্রগতিশীল' অংশের মনোভাব বলে ধরতে পারেন। মারোয়ারী শিল্পপতি বিড়লা, ইংলন্ডে সমিতিবদ্ধ সি. ই. এস. সি. থেকে আধা সরকারি বেঙ্গল কেমিক্যাল কর্তৃপক্ষ দূষণরোধের প্রশ্নে ঔদাসীন্যের প্রতিযোগিতায় তারা পরস্পরের সোদর ভাই মাত্র। মাত্র পাঁচ লাখ টাকার অভাবে নাকি সালফিউরিক অ্যাসিড প্ল্যান্টে লিকেজ হচ্ছে।

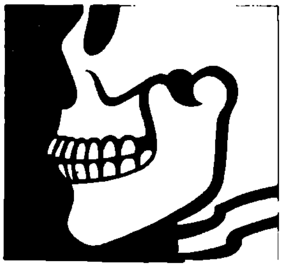

প্রসঙ্গ: ইউনিয়ন কারবাইড

সুমিত মিত্র

মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা ইউনিয়ন কর্পোরেশন ভারতে তার সাবসিডিয়ারি কোম্পানি ইউনিয়ন কারবাইডের মাধ্যমে সারা ভারতে জাল ছড়িয়ে রেখেছে। ব্যাটারি এবং কীটনাশক ঔষধ উৎপাদন ও ব্যবসায়ে এদের একচেটিয়া রাজত্ব। বাজারে উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য তিন হাজার ডলার বিনিয়োগ এবং আড়াই লক্ষ পাইকার নিযুক্ত করেছেন এঁরা। ভারত সরকার ইউনিয়ন কারবাইডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। জন্ম নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার জন্য কিছু সামগ্রী ও এঁরা তৈরি করে। এঁদের উৎপাদিত সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে টর্চলাইট ও পার্টস, জিঙ্ক এ্যালয়, জিঙ্কপ্লেট, অন্যান্য অ্যালয়, বিভিন্ন অর্গানিক কেমিক্যাল, পলিথিন, সিনেমা আর্ক কারবন। কারবন ইলেকট্রোড, ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড, কীটনাশক ফরমূলা এবং সিবাইল আইশো-সায়ানেট কীটনাশক ইত্যাদি। এছাড়াও এরা করেন সামুদ্রিক মাছের ব্যবসা ও সামুদ্রিক পণ্যের কারখানাগুলি (১৬) রয়েছে ভূপাল, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা হায়দ্রাবাদ, লখনৌ এবং বিশাখাপত্তনম। ভারতের হেড অফিস কলকাতা। এই বিরাট কর্মকান্ডের অনেকটাই দেশের মানুষদের কাছে অজানা থাকলেও মূলত এভারেডি ব্যাটারির সূত্রে ইউনিয়ন কারবাইড দেশের সর্বত্র পরিচিত।

বৃটেনের এভারেডি কোম্পানি ১৯২৬ সালে ভারতের কলকাতায় টর্চ ব্যাটারি তৈরির কারখানা পত্তন করে এবং একচেটিয়া কারবারী হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে আসে -- বকার ইউনিয়ন কারবাইড ঐ ব্যাটারি উৎপাদনে একচেটিয়ার প্রতিযোগিতায় এগিয়ে চলে। ১৯৩৪ সালে এই কোম্পানি বৃটেনের এভারেডি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয় এবং ভারতের ফ্যাক্টরি এদের হাতে যায়। তখন নাম পাল্টে রাখা হয়েছিল ন্যাশানাল কারবন কোম্পানি। ১৯৪০ সাল থেকে ৬২র মধ্যে কোম্পানির নতুন কারখানা তৈরি হয়ে যায় কলকাতা মাদ্রাজ এবং হায়দ্রাবাদে। ১৯৬২ সালে লখনৌতে টর্চকেস ফ্যাক্টরি, এইভাবে ব্যাটারির উৎপাদন বছরে দেড় কোটি থেকে (১৯৩৫) ছ কোটি সত্তর লাখে দাঁড়ায় (১৯৮০)। ব্যাটারি ও টর্চ উৎপাদনের সাফল্যের পর থেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের পালা। যেমন ১৯৬৩ সালে কলকাতায় গড়ে তোলে ফটো তৈরির প্লেট নির্মাণ। ১৯৬৬ সালে ইথাইলিন পলিথিন উৎপাদন ফ্যাক্টরি স্থাপন করে। এ বছরই ভারতে তূলা চাষ কীটের আক্রমণে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই সুযোগে মার্কিন কারবাইড বিনামূল্যে প্রচুর কীটনাশক ঔষধ সরবরাহ করে এবং এদেশে কীটনাশক ঔষধ প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। ১৯৭৩ সালে মিথাইল আইসো সায়ানাইট গ্যাস আমদানি করে কীটনাশক ঔষধ নির্মাণ প্রকল্প বসায় ভূপালে। তখন ঐ গ্যাস এখানে উৎপাদন হত না। ইতিমধ্যে গ্যাস উৎপাদনে আবহাওয়া মারাত্মক রকমে দূষিত হয় বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউনিয়ন কারবাইডের ভারজিনিয়া প্রকল্প বসাবার ব্যবস্থা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তির ব্যাপারটা জানা ছিল বলে এ দেশেও আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী পি. সি. শেঠী প্রভৃতির উদ্যোগে ভূপালে ঐ প্রকল্প বসাবার ব্যবস্থা হয়। মুখ্যমন্ত্রী শেঠী অতিরিক্ত ৫৫ একর জমি সংগ্রহ করে দেন। ১৯৭৭ 'মিক' উৎপাদন লাইসেন্স স্থগিত থাকে। ১৯৭৯ সালে ঐ লাইসেন্স বেরিয়ে আসে এবং ১৯৮০ থেকে উৎপাদন শুরু হয়। সম্প্রতি আরও দুটি লাইসেন্স নিয়ে ফ্যাক্টরি সম্প্রসারণের উদ্যোগ তাঁরা নিয়েছিলেন। কিন্ত ইতিমধ্যে এই একই বিষয়ের কারবারি ফ্রান্সের বহুজাতিক সংস্থা (Phone-Poulence) বৃটেনের মে এ্যান্ড বেকার ভলতাসের সঙ্গে যুক্তি করে ফ্যাক্টরি বসাবার উদ্যোগ নেবার ফলে এই দুই বহুজাতিকে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে ট্রম্বের কারখানা ভলটাস পাবে এই রফায় হয়েছে। তথাপি মার্কিন কারবাইডের বাজারে ফরাসি কোম্পানি অনুপ্রবেশ করার জন্য জোর তৎপরতা চালিয়েছে। ঐ ফরাসি কোম্পানি এখন ভূপাল ট্রাজেডিকে তার ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ নেবার জন্য তৎপরতা শুরু করেছে। বৃটেনের মে এ্যান্ড বেকারও নিজেদের স্বার্থে এদের মদত জুগিয়ে চলেছেন। এর ফলেই ভারতের বৃটিশ সমর্থক কাগজে কারবাইড বিরোধী হাওয়া তোলা হচ্ছে। অর্থাৎ গণ হত্যার বিরুদ্ধে হাওয়া নয়, তাকে কাজে লাগানো হচ্ছে কারবাইডের প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষে।

কারবাইড বিদেশের মাল যত আমদানি করে ও তার বিনিময়ে ভারতের বিদেশি মুদ্রার যত ব্যয় হয় তার বিনিময়ে বিদেশি মুদ্রা আনে অনেক কম। যেমন ১৯৮০ সালে

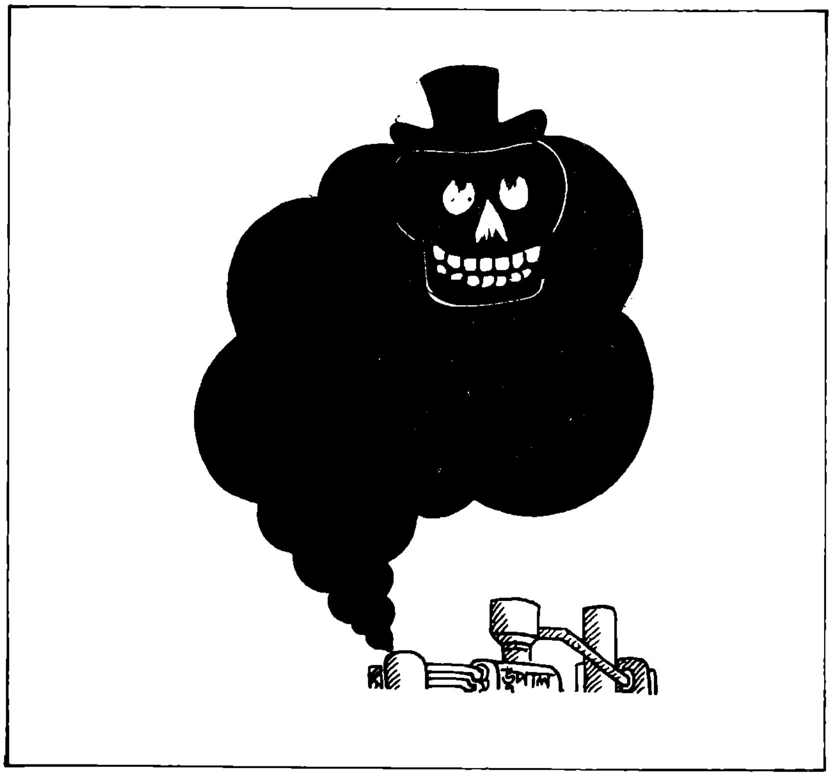

গঙ্গার সাথে সংযোগকারী খালে পড়ছে 'কস্টিক মাড';উড়ছে সালফারের বিষাক্ত ধোঁয়া, পাশে শ্রমিক বস্তি।

কাঁচামাল যন্ত্রপাতি কারিগরি বিদ্যা ও কুশলী আমদানি বাবদ এবং শেয়ার মুনাফার ডিভিডেন্ট বাবদ ভারতের বিদেশি মুদ্রা ব্যয় হয়েছিল ১৯৭৫ সালে ১০ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা, ১৯৮০ সালে ১৩ কোটি ৮২ লক্ষ কোটি টাকা। রপ্তানি বাবদ ভারতের বিদেশি মুদ্রার আয় ১৯৭৩ সালে ৩ কোটি ৯ লক্ষ টাকা,১৯৮০ সালে ৭ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ঘাটতি ১৯৭৩ সালের ৭ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা, ১৯৮০ সালে ৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা।

ইউনিয়ন কারবাইড লগ্নী পুঁজির অনেক বেশি মুনাফা দেশে পাঠিয়েছে।

ভূপালে কীটনাশক উৎপাদন যেদিন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকেই অঢেল টাকা মুনাফা হিসেবে দেশে পাঠানো হয়েছে। তাদের ঐ কীটনাশক প্রকল্পে লগ্নী করেছিল ২৪ কোটি টাকা আর ১৯৮৩'র মধ্যেই ২৫ কোটি টাকা মুনাফা হিসেবে দেশে পাঠিয়েছে, মুনাফা হয়েছে আরও বেশি কারণ তাদের ৪০ শতাংশ এ দেশীয় শেয়ার হোল্ডারদের মুনাফা এ দেশেই দিয়েছে, আর পুনরায় লগ্নী রিজ আছে। ভারতে এই কোম্পানির অনেক কারখানা আছে। তাদের ১৯৮৩ সালের মোট মুনাফার অঙ্ক ৮ কোটি ডলার বা ৮০ কোটি টাকা।

ইউনিয়ন কারবাইডের হাতে আরও জমি তুলে দেবার জন্যই গণ উৎখাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সঞ্চিত গ্যাস নিঃশেষ করার কাজ তরান্বিত করার অন্যতম উদ্দেশ্য হল কারখানা সংলগ্ন এলাকা থেকে বস্তিবাসীদের উৎখাত করে ঐ জমি কারখানা সম্প্রসারণের জন্য কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া। কোম্পানি লোকসানের ফলে গ্যাস উৎপাদন প্রকল্প বন্ধ করে দেবে বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, তা সত্য নয়। কোম্পানি ট্রম্বের রাসায়নিক কারখানা সম্প্রসারণের লাইসেন্স পেয়েছে। তাই পুরানো ভূপাল থেকে ৪০ শতাংশ লোককে উৎখাত করে ঘন-বসতি হাল্কা করে কারখানা চালু করার যুক্তি হাজির করবে, অন্যদিকে ফাটকাবাজদের হাতে জলের দামে জমি তুলে দেবে।

মারণ গ্যাসে গণ-হত্যায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রও পিছিয়ে নেইঃ ১৯৮২'র ২৪ মার্চ রয়টার প্রচারিত সংবাদে জানা যায় যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র মারণগ্যাস ব্যবহার করে লাওস, কাম্পুচিয়া এবং আফগানিস্তানে ১০ হাজার মানুষ হত্যা করেছে। প্রচার করা হয়েছে যে, ১৯৭৫ থেকে লাওসে মারণগ্যাস আক্রমণে ৬৩১০ জন, ১৯৭৮ থেকে কাম্পুচিয়াতে ৯৮১ জন এবং ১৯৭৯ থেকে আফগানিস্তানে ৩০৪২ জন নিহত হয়েছেন। তাদের ব্যবহৃত মারণগ্যাসের নাম 'মাইক্রোটকসিন'।

সম্প্রতি ইরাক ইরাণ যুদ্ধে ইরাক রাশিয়ার মারণ-গ্যাস ব্যবহার করে ছিল এই অভিযোগ উঠেছে, ১৯৭৮ এ রাশিয়ার সাইবেরিয়াতে অবস্থিত মারণ গ্যাস উৎপাদন কারখানার এক মারাত্মক লী-কেজের ফলে অনেক লোক আক্রান্ত হয়েছিলেন বলেও পশ্চিমী সংবাদপত্রে জানানো হয়েছে। □

সবচেয়ে বিপদজনক কেমিক্যাল কারখানার সরকারি তালিকা।

কেশোরাম রেয়ন -- হুগলী।

হিন্দুস্থান হেভি কেমিক্যালস -- ২৪-পরগণা।

দূর্গাপুর কেমিক্যালস -- দূর্গাপুর।

অ্যালকেলি কেমিক্যাল কর্পোরেশন অফ্ ইন্ডিয়া -- হুগলি।

(এটি এখন ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভ নামে পরিচিত)।

শ'ওয়ালেশ -- হলদিয়া।

ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ্ ইন্ডিয়া -- হলদিয়া এবং দূর্গাপুর।

হিন্দুস্থান লিভার -- দূর্গাচক, হলদিয়া।

বেঙ্গল কেমিক্যাল্স -- সোদপুর।

দি ফস্‌ফেট কোম্পানি -- রিষড়া, হুগলী।

জয়শ্রী কেমিক্যালস -- খড়দহ।

কলকাতার হাওয়া

কলকাতার বাতাসে মিশে গেছে মানুষের শরীরের পক্ষে অত্যান্ত ক্ষতিকর, এমন সব গ্যাস। সম্পূর্ণ ভাবে বাতাসকে দূষণমুক্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই দূষণের মাত্রাকে একটি অক্ষতিকর সীমায় বাঁধতে না পারলে সমস্যাটা একদিন হাতের বাইরে চলে যাবে। অথচ কলকাতার বাতাস দূষণমুক্ত করবার জন্য রাজ্য সরকারের কার্যকলাপ অত্যান্ত আপত্তিকর। রাজ্য সরকারকে অনেকেই সরাসরি অভিযুক্ত করেছেন কলকাতা শহরের জল বাতাস দূষণ বিষয়ে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য। এই শহরের সরকারি পরিবহনে স্মোক অ্যাবেস্টার ব্যবহার না করা এর একটি দৃষ্টান্ত। সরকারের সুযোগ ছিল শহরবাসীর কাছে একটি উদাহরণ সৃষ্টি এবং তার সদিচ্ছা প্রমাণের।

এই শহরের দেড় লক্ষরও বেশি যানবাহনের জন্য দৈনিক যে ডিজেল ও পেট্রল পোড়ানো হয় তার পরিমাণ ১,১৩,১৭০ কিলোলিটার ও ১,০০,৭৩৭ কিলোলিটার পেট্রল। এইভাবে কলকাতা ও হাওড়ার যানবাহনের দৌলতে কলকাতার প্রাপ্য দৈনিক ২১০ মেট্রিক টন ধোঁয়া। এর সঙ্গে এসে যোগ দিচ্ছে লোকমোটিভ থেকে বেরিয়ে আসা আরও ১০৫ মেট্রিক টন। এই বিপুল পরিমাণ ধোঁয়া অবশ্য অনেকটা কমিয়ে আনা যায় কিছু আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে।

ধোঁয়ার উৎস অবশ্য আরও আছে। কারণ এখানে রান্নার কাজে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে দৈনিক ৭২০ মেট্রিক টন কয়লা, ১২০০ মেট্রিক টন কাঠ এবং ১৩০০ কিলোলিটার কেরোসিন। এছাড়া আছে ফ্যাক্টরির জ্বালানী। সেখান থেকে কলকাতার ভাগে জুটছে দৈনিক প্রায় দু'শ টন ধোঁয়া আর ধুলো। এসব ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উঁচু চিমনি এবং কিছু নির্দিষ্ট যান্ত্রিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে এই দূষণের মান অনেকটা নামানো সম্ভব।

সর্বক্ষণই এইসব গাড়ি-ঘোড়া, ধুলো-ধোঁয়ার মাঝে যাদের সময় কাটাতে হয়। এরকম অনেক রকমের পেশার মধ্যে একটি

তৃতীয় বিশ্বে বিপজ্জনক কীটনাশকের উৎপাদক, ক্রেতা এবং বিক্রেতা রাসায়নিক কোম্পানির তালিকা

কোম্পানি	নিষিদ্ধ/ ব্যবহারে বাধানিষেধ	পরীক্ষাধীন কীটনাশক	কোন বাধানিষেধ নেই এমন কীটনাশক
এলায়েড কেমিকাল	কেপোন, মিরেক্স।	–	–
এমডাক	ডি বি সি পি	–	–
এমেরিকান সায়নামাইড	কেপোন, মিরেক্স	টক্সাফেন, ২,৪-ডি	ম্যালাথিয়ন, প্যারাথিয়ন
বিএ এস এফ (প: জার্মানী)	২,৪,৫-টি-	২,৪-ডি	–
বায়ার (প: জার্মানী)	ডি ডি টি, হেপ্টাক্লোর, লিনডেন	টক্সাফেন	প্যারাথিয়ন
মেলা মার্ক (প: জার্মাণী)	এলড্রিন, ডিয়েলড্রিন, ডিডিটি এনড্রিন, হেপ্টাক্লোর, ক্লোরডেন, লিনডিন, ২,৪,৫-টি	টক্সাফেন ২,৪-ডি	প্যারাথিয়ন
শেভ্রন	ডিডিটি, এলড্রিন, ডিয়েলড্রিন, হেপ্টাক্লোর, ক্লোরডেন, এনড্রিন, লিনডেন, বি এইচ সি, সিলভেক্স।	টক্সাফেন, প্যারাকোয়াত	ম্যালাথিয়ন
সিবা-গাইগি (সুইস)	–	২,৪-ডি	–
ডাও	২,৪,৫-টি, সিলভেক্স, ডি বি সি পি	২,৪-ডি	–
ডুপন্ট	–	ই পি এন	প্যারাথিয়ন
এফ এম সি	হেপ্টাক্লোর	–	ম্যালাথিয়ন
ডবল্যু, আর গ্রেস	–	টক্সাফেন	–
হারকিউলিস	–	টক্সাফেন	–
হেকস্ট (প: জার্মানী)	ডি ডি টি	–	প্যারাথিয়ন ম্যালাথিয়ন
হুকার	বি এইচ সি, লিনডেন, মিরেক্স	–	–
ইম্পিরিয়াল কেমিকালস (ইউ. কে)	বি এইচ সি, লিনডেন	–	–
ফের-মেকসি কেম	–	–	প্যারাথিয়ন
মোনসান্টো	–	২,৪-ডি	প্যারাথিয়ন

হল ট্রাফিক পুলিশের চাকরি। দেখা গেছে পরীক্ষা করে, ট্রাফিক পুলিশের রক্তের নানা রকম পরিবর্তন ঘটে গেছে। এধরনের গবেষণা এই শহরে হয়না বললেই চলে। ফলে আমরা জানতে পারি না ঠিক কি কি ভাবে দৈনিক আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।

এই যে ধুলো আর ধোঁয়া এর মধ্যে পাওয়া গেছে সীসা, আর্সেনিক, নিকেল ইত্যাদি বিষাক্ত ধাতুচূর্ণ। পেট্রলের ধোঁয়ার ভাসমান সীসা নেফ্রাইটিস, স্নায়বিক রোগ, মস্তিষ্কে রক্ত সংবহন জনিত রোগের জন্ম দেয়।

১৯৭৭ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৮ সালের মার্চ পর্যন্ত C. M. D. A.-র এক সমীক্ষায় দেখা গেছে টালিগঞ্জে বাতাসে ভাসমান পদার্থ কণার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এবং তার পরের সারিতে আছে ডালহৌসি, হাওড়া, ভবানীপুর, মানিকতলা। টালিগঞ্জ হাওড়াতে ঐ সময়ের পাওয়া গড় ভাসমান পদার্থ কণার দৈনিক পরিমাণ ছিল ৪৮০–৫০০ মাঃ গ্রাম/ঘঃ মিঃ। তবে কখনও কখনও দেখা গেছে এই পরিমাণ বেড়ে প্রায় ৭৫০ মাঃ গ্রাঃ/ ঘঃ মিঃএ পৌঁছেছে। বাতাসে ভাসমান বিষাক্ত পদার্থ কণার মাত্রা ৮০০–১০০০ মাঃ গ্রাঃ/ঘঃ মিঃ পৌছালে মৃত্যুর হার বেড়ে যায়।

এই বিষাক্ত পদার্থ কণা যে কেবল বাতাস নষ্ট করছে তা নয়। দেখা গেছে টালিগঞ্জ, কসবা, তিলজলা, মানিকতলা, বেলগাছিয়া প্রত্যেক মাসে প্রতি বর্গ কিলোমিটার এলাকায় গড়ে ৪৩,২২,২৪,১৯ এবং ১৯ মেট্রিকটন বিষাক্ত বায়ু মিশ্রিত ধুলো মাটির উপরিভাগে জমা হচ্ছে। এই ধুলো রাস্তার পেট্রল, ডিজেলের সংগে মিশে শহরের মাটিকে কলুষিত করছে।

এরপর সালফার ডাই-অক্সাইডের কথা। এই গ্যাস প্রতি ঘন মিটারের ১১৫ মাঃ গ্রাঃ পৌঁছালে ব্রংকাইটিস ও ফুসফুসের ক্যানসার থেকে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। ১৯৭৮ সালে গবেষণায় ধরা পড়েছে কলকাতা শহরে শতকরা ২০ ভাগ অঞ্চলে এই গ্যাসের মাত্রা প্রতি ঘনমিটারে ৮০ মাঃ গ্রাঃ তে পৌঁছে গেছে। এবং কাশীপুর, ডালহৌসিতে প্রায় শতকরা ১০ ভাগ অঞ্চলে প্রতি ঘনমিটারে ১০০ মাঃ গ্রাঃতে পৌঁছেছে। এটা প্রায় ৭ বছর আগের হিসেবে। আজ অবশ্যই বাতাসে এই গ্যাসের পরিমাণ আরও বেড়েছে, কারণ এটা বন্ধ করার কোন প্রচেষ্টা হয়নি। অবস্থা এই ভাবে চললে মারণ মাত্রা ছুঁয়ে ফেলতে

মনট্রোস	ডিডিটি, এনড্রিন	–	প্যারাথিয়ন।
নিসান (জাপান)	–	ই পি এন	–
ফাইজার	–	–	ম্যালাথিয়ন।
রোহম এন্ড হাস	সিলভেক্স	টক্সাফেন	প্যারাথিয়ন।
শেরিং (পঃ জার্মানী)	এলড্রিন, বি এইচ সি হেপ্টাক্লোর	–	প্যারাথিয়ন
শেল (ইউ কে-নেদারল্যান্ড)	এলড্রিন, ডি এল ড্রিন, ডিডিটি, ডি বি সি পি, এনড্রিন, ২,৪,৫-টি।	২,৪-ডি	প্যারাথিয়ন।
স্টফার	ডিডিটি, ডি এল ড্রিন	ই পি এন, ২,৪-ডি	ম্যালাথিয়ন প্যারাথিয়ন
সুমিটোমো (জাপান)	–	–	ম্যালাথিয়ন
ইউনিয়ন কার্বাইড	ডি ডি টি, মিরেক্স, হেপ্টাক্লোর, ক্লোরডেন, এনড্রিন	– –	– –
ভেলসিকল	ক্লোরডেন, হেপ্টাক্লোর, ফসভেল, এনড্রিন।	ই পি এন	প্যারাথিয়ন

এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ পেস্টিসাইড তৃতীয় বিশ্বে অবাধে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ডি ডি টি, এলড্রিন, ডি এল ড্রিন, হেপটাক্লোর প্রভৃতি কীটনাশকের ব্যবহার। এমনকি যে সমস্ত কীটনাশকে কোন বাধানিষেধ নেই সেই সমস্ত পদার্থের বিষক্রিয়ায় তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। নিষিদ্ধ হোক বা নাই হোক প্যারাথিয়ন এই সমস্ত কীটনাশকের মধ্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক। আর পরীক্ষাধীন কীটনাশকের মধ্যে টক্সাফিন, প্যারাকোয়েট, ই পি এন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এনভারণমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সীর মতে "সন্দেহজনক রাসায়নিক পদার্থ"।

বাসের ধোঁয়া

আমাদের আর খুব বেশি দিন লাগবার কথা নয়।

সালফার ডাই-অক্সাইড ছাড়া কলকাতার বাতাসে মিশে আছে প্রচুর পরিমাণে মনোক্সাইড গ্যাস। এই গ্যাস শরীরে নিশ্বাসের সংগে প্রবেশ করে ব্লাড-টিস্যুর প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের পরিমাণকে কমিয়ে দেয়। এবং অজাত শিশুকে মাতৃগর্ভে বেড়ে উঠবার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত করে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে, কলকাতা শহরের বাতাসে এই গ্যাসের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য তেমন কোন পরীক্ষাই হয়নি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন বাতাসে এক লক্ষ ভাগে মাত্র এক ভাগ কার্বন-মনোক্সাইড থাকলে ৮ ঘন্টায় সুস্থ সবল ব্যক্তিরও মানসিক ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে।□

দুর্গাপুর

জীবনের চেয়ে কি শিল্প বড়

উৎপল অধিকারী

দুর্গাপুরের মাটিতে পা রাখলেই প্রথমে যা আপনার দৃষ্টি গোচর হবে তা হল শিল্পনগরীর দিগন্ত রেখা ধূসর ও কালিমাময়। যেন কুয়াশা মাখা একটি শীতের সকাল। বিভিন্ন কারখানার বড় বড় চিমনি থেকে লালচে কালোধোঁয়া সবেগে বেরিয়ে আকাশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। রাস্তায় পাশের জমিতে বা জলের উপর কালো ছাঁইয়ের পুরু এক আস্তারণ। রাস্তায় হাঁটতে গেলে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা আপনার চোখে লেগে চোখ জ্বালা করবে কিংবা দাঁতে লেগে কিচকিচ করবে। সন্ধ্যের দিকে চোখ মেলে হাঁটা আপনার দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে এইসব ভাসমান ধূলিকণার জন্য। সঙ্গে একটা ভারি বাতাস আপনাকে দমবন্ধ অবস্থা করে তুলবে। বিশেষত এই শীতের সময়। যে কোন রসায়নবিদ্ এই বাতাসে এ্যামোনিয়া, সালফারডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড, ক্লোরিনের গন্ধ খুঁজে পাবেন। বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা বা পার্টিকুলেট ম্যাটার থেকে আয়রণ, আয়রণ অক্সাইড, এ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, কার্বনমনো অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, সিলিকা ও কার্বণ খুঁজে পাবেন। এইসব মিশ্র রসায়নিক ভাসমান ধূলিকণা যে কত ক্ষতিকর তা দুর্গাপুরের যে কোন স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে গেলেই অনুমান করা যাবে। শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন ইমারজেন্সি ইউনিট ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে প্রতিদিন গড়ে শতকরা পনের জন 'ফরেন বডি কমপ্লেন' নিয়ে চিকিৎসার জন্য আসেন। দুর্গাপুর থার্মল পাওয়ার স্টেশন, দুর্গাপুরের

দুইস্টীল প্ল্যান্ট-ডি.এস.পি ও এ.এস.পি, ফিলিপস্ কারবন, ডি.পি.এল, দুর্গাপুর কেমিক্যালস্, হিন্দুস্থান সার কারখানা, সিমেন্ট কারখানা থেকে প্রতিদিন নির্গত পূর্বোলিখিত রাসায়ণ যুক্ত 'পার্টিকুলেট ম্যাটার' বা ধূলিকণা থেকে চোখের অসুখ ছাড়াও সর্দি-কাশি, মাথাধরা, অ্যাজমা থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত নানান ধরণের রোগে আক্রান্ত রোগীরা আসেন। দুর্গাপুরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ভবানী প্রসাদ সাহুর মতে সিলিকা ও কার্বণ যুক্ত ধূলিকণা থেকে 'সিলিকোশিস্' ও 'এ্যানথ্রাক্রোশিস্' রোগের সৃষ্টি হতে পারে। দুর্গাপুরে রুশ গবেষণা কারীদের মতে মারুতচুল্লী থেকে অবিরত কার্বণ মনোক্সাইড নির্গমনই স্টীল প্ল্যান্টের কাছাকাছি বসবাস-কারীদের রক্তশূণ্যতার অন্যতম প্রধান কারণ। কলকারখানা থেকে নির্গত এসব বিষাক্ত গ্যাসের মধ্যে সালফার ডাই অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, ও জোন(O_3), এ্যাসিড মিস্ট্ শুধু মানুষের ক্ষতি করে না। গাছপালা ও ঘরবাড়িরও প্রচুর ক্ষতি করে। তাই এখানে দেখা গেছে গ্রামের সঙ্গে সমবয়সী গাছে ফুল ও ফল দেরি করে ধরতে। পাতাগুলোকে কুঁকরে দেয়।

বায়ু দূষণের পাশাপাশি শব্দ দূষণ, মৃত্তিকা দূষণ ও তেজষ্ক্রিয় দূষণ বাড়ছে। দুর্গাপুর আসানসোল শিল্পাঞ্চলের জলদূষণ আরেক ভয়াবহ সমস্যা। দুর্গাপুর আসানসোলের পানীয় জলের প্রধান উৎস দামোদর নদ ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান দূষিত জল বহনকারী নদী হিসেবে চিহ্নিত। এই দূষিত জল জনসাধারণের, এমন কি জলজপ্রাণীর পক্ষেও একান্ত প্রাণহানিকর। চাষ আবাদের পক্ষে ক্ষতিসাধনকারী, সৌন্দর্যের পরিপন্থী। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে সবচেয়ে বেশির ভাগ লোক ভোগে জলজনিত রোগে। যেমন জনডিস, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, এনটেরিক ফিবার, টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, আমাশয়, উদারময় ও অম্লত্বে।

দুর্গাপুরের অধিকাংশ লোক শব্দদূষনের জন্য অল্প বিস্তর বধির। এর কারণ হিসেবে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে কলকারখানায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ব্লোয়ার, টারবাইন, ভেন্টিলেশন ফ্যান, লোকো সাইরেন ও বিভিন্ন যানবাহন হতে নির্গত বিকট শব্দ। আই.এস.আই. এর চার্ট অনুযায়ী কারখানায় প্রতিদিন ৮ ঘন্টা কাজ চলার সময় শব্দ মাত্রা হওয়া উচিত ৮৫ ডেসিবলের মধ্যে। কিন্তু এ অঞ্চলের বেশির ভাগ কারখানাতেই এইমাত্রা ১০০ থেকে ১৩৫ এর মধ্যে। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় এই শব্দ আরো বেশি।

এই শব্দ দূষণ শুধুমাত্র বধিরতা বাড়ায় না, নানারকম অসুখের সৃষ্টি করে। এর ফলে উচ্চরক্তচাপ, পেপটিক আলসার, কান ভোঁ ভোঁ, মাথাধরা, সাইকোশিস, নিউরোশিস্, উন্মাদরোগ থেকে আরম্ভ করে কাজকর্মে অধিক ভুলভ্রান্তি, বেশিমাত্রায় দুর্ঘটনা, অধিক অনুপস্থিতির হার, কাজকর্মে মনোযোগের অভাব বাড়ছে।

শিল্পোন্নয়ণ যেমন যে কোনও দেশের অগ্রগতির মূল সোপান। তেমনি মানুষই তার সৃষ্টি কর্তা। তাই প্রশ্ন উঠেছে

শিল্প বড় না, মানুষের জীবন বড়? এ নিয়ে দুর্গাপুরের নাগরিকদের মধ্যে নানারকম ক্ষোভ জমা হলেও তা ব্যাপক বিক্ষোভে পরিণত হয়নি। তবে রাজনৈতিক দলগুলি থেকে মাঝে মাঝে পোস্টার পড়ে: 'শিল্পের চেয়ে জীবন বড়। যে কোন মূল্যে শিল্প থেকে উদ্ভূত পরিবেশ দূষণ বন্ধ করতে হবে।' এইসব দাবির ফলে পশ্চিমবঙ্গে আবহাওয়া দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যে আইনের প্রয়োগ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তা '৭৯ সালে তার প্রয়োগ পরিধি দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই এলাকার মানুষ বিশেষ উপকৃত হন নি। কারণ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বিভিন্ন কারখানার বিরুদ্ধে কোন বিশেষ ব্যবস্থা এখনো নিতে পারে নি। তাদের কাজকর্মে শৈথিল্যের জন্য এই এলাকার ৯০ শতাংশ মানুষ এখনো এই সংস্থার নাম জানেন না। পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থসারথি চৌধুরী জানান পরিবেশ দূষণকারী কয়েকটি সংস্থার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আদালতে মামলা করা হয়েছে। কিন্তু পাঁচ-ছ'বছর কেটে যাওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোন মামলার রায় বেরোয় নি।

দুর্গাপুর-আসানসোলে যে শিল্পসংস্থাগুলি সবচেয়ে বেশি পরিবেশ দূষণ কাজে লিপ্ত তারা অধিকাংশই সরকারি প্রতিষ্ঠান। এইসব প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তাঁরা পরিবেশ নিয়ে যে চিন্তিত নন এমন নয়, কিন্তু তাঁরা নাকি টাকার জন্য কিছু করে উঠতে পারছেন না। কারণ পরিবেশ দূষণ রোধ বা নিয়ন্ত্রণ করতে যে টাকার দরকার, তাতে কারখানার অনেক বেশি উৎপাদন সম্ভব। কারখানার আয় বাড়ে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা রোধ করতে খামকা একগাদা টাকা নষ্ট করে হবে কি? অথবা এই টাকা কে খরচ করবে এ নিয়ে 'বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার' মতো অবস্থা হয়েছে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের। এসব কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আরো একটি জিনিষ লক্ষ্য করা গেছে। নিজেদের দোষ ঢাকতে অপর প্রতিষ্ঠান কত বেশি পরিবেশ দূষণ করছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ অন্যে অন্যায় করছে বলেই আমি অন্যায় করেছি। শাস্তি দেবার কেউ নেই। একমাত্র আদালত ছাড়া।

এসব কারণেই ডি.পি.এল. ও ডি.টি.পি.এস.কারখানার 'ফ্লাই এ্যাস' নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 'ইলেক্ট্রো স্টেটিক্ স্পেটিটর' যন্ত্র আজ বহুদিন ধরে অকেজো। ডি.পি.এলের পাঁচটি ইউনিটের মধ্যে মাত্র দুটি ইউনিটে এই যন্ত্র ছিল। অন্যান্য কোন ইউনিটে এই যন্ত্র শুরু থেকেই নেই। নবনির্মিত ষষ্ঠ উইনিটটিতে এই যন্ত্র বসানো হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

ডি.পি.এলের অকেজো এই দুটি ইলেক্ট্রো স্টেটিক স্পেটিটর যন্ত্র সারতে নাকি ৩ কোটি টাকা লাগবে। 'ভেল' কে নাকি সারাতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কয়েকবছর পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এইযন্ত্র মেরামতি হয়নি। এই কারখানার জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অভিমত এক একটি কেমিক্যালস্ কোকপ্ল্যান্টের বসানোর খরচ প্রায় ১৬ কোটি টাকা। এর যদি পলিউশন ট্রিটমেন্ট করতে হয় তবে প্রতি প্লান্ট পিছু ৭০/৮০ লাখ টাকা খরচ করতে হবে। এই টাকা খরচে পলিউশন ট্রিটমেন্ট করার ব্যবস্থা করলে শুধু পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ হবে না বেশ কিছু কেমিক্যালস উদ্ধার করে তা বাই-প্রোডাক্টের কাজে লাগানো যেতে পারে। এ ছাড়া জলে 'ডাইলুশেন' করতে বর্তমানে যে কয়েকলক্ষ টাকা খরচ হয় তা বাঁচানো যেত। 'ডাইলুশন' করতে যে অতিরিক্ত জল খরচ হয় তা অন্যকাজে ব্যবহৃত হত কিংবা অন্য কারখানায় বিক্রি করা যেত। কিন্তু এটাকা খরচ করবে কে? ঠিক একই কারণে ডি.টি.পি.এস.কারখানার চারটি ইউনিটের মধ্যে ১ নং ও ২নং ইউনিটে 'ইলেক্ট্রো স্টেটিক স্পেটিটর' যন্ত্র নেই। বাকি দুটি ইউনিটের এই যন্ত্র প্রায় অকেজো থাকে। 'ফ্লাই এ্যাশ' কিছু নিবারণ করা যায় বনসম্পদে। কিন্তু আধুনিক নগর সভ্যতার জন্য ১৩২ বর্গ কিলোমিটার শালবনের অধিকাংশ কারখানার এ্যাশ-পন্ড নেই। থাকলেও তা অকেজো বা ভর্তি। ফলে বিভিন্ন কারখানা থেকে দূষিত রাসায়নিক জল দামোদরে মিশে এই নদীকে সবচেয়ে বিষাক্ত করে তুলেছে।

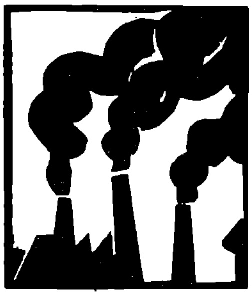

বিষাক্ত নদ দামোদর :

৫৪১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এই নদী বিহারের পালামৌ জেলা থেকে উৎপত্তি হয়ে মানভূম, হাজারিবাগ হয়ে বর্ধমান মেদনীপুর, হুগলী জেলা সহ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা বেয়ে ফলতার কাছে হুগলী নদীতে মিশেছে। আসানসোলের কাছে মিলেছে বরাকর নদী। এই দুই নদী বিহারের কয়লাখনি ও শিল্পের দূষিত জল বয়ে এনে আসানসোল দুর্গাপুরে আরো ভয়ানক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে দুর্গাপুর ব্যারেজের কাছে দামোদর নদের নিম্ন অববাহিকায় কৃষ্ণনগরের কাছে এই নদের জলে আছে ১০ লক্ষ ভাগের মধ্যে ০.১৯ ভাগ পারদ, সায়নায়েড ০.০৫, এ্যামোনিয়া ৯.০০, দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ ২৭৯, ভাসমান পদার্থ ৪০ ভাগ, সীসা ১.১২, ক্যাডিয়াম ০.০৫ ভাগ, ফেনল ০ ০৭, দস্তা ০.৩ ভাগের কিছু বেশি। এই হিসেব ৭৮ সালের বন্যার পরের বছর। ধরে নেওয়া যেতে পারে ঐবছর বন্যায় বিপুল জলরাশিতে আগেকার জমা বিষাক্ত পদার্থ সব ধুয়ে মুছে গেছে। এই পরিমাণ শুধু এক বছরে জমছে। সুতরাং এই ক'বছরে এই হিসেব আরো কয়েকগুণ বেড়েছে। দামোদর নদে যে কটি নালা বিভিন্ন কারখানার দূষিত জল বহন করে দামোদরে তা ফেলছে তার মধ্যে প্রধান দুটি নালা হল তামলা ও সিঙ্গারা নালা।

ডি.পি.এলের পিছনে কালিপুর গ্রামে তামলা নালা এবং গোশালা গ্রামের সিঙ্গারা নালার জল পরীক্ষা করলে বোঝা যায় এই জল কত বিষাক্ত। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা থেকে জানা গেছে, এই জলে এ্যামোনিয়া ১০ লক্ষ ভাগে ৪০ ভাগ, ফেনল ১০ লক্ষ ভাগে ৬ ভাগ, সালফাইড ১০ লক্ষ ভাগে ৫ ভাগ, জৈবপদার্থ ১০ লক্ষ ভাগে ৭০০ ভাগ, দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ ১০ লক্ষ ভাগে ৩০৫ ভাগ এবং ভাসমান কঠিন পদার্থ এই ভাগে ১৮৫ ভাগ। ডি.এস.পি.র দূষিত জল এই নালায় মেশায় এ পরিমাণ আরো বহুগুণ বাড়ে। তখন দস্তা থাকে ০.৪৭ ভাগ, দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ ৩১১ ভাগ। গোশালা গ্রামের কাছে সিঙ্গারা নালার জল নিয়ে সমীক্ষা করে জানা গেছে এই জল রাসায়নিক বিষে পূর্ণ। এই জলে ১০ লক্ষ ভাগে এ্যামোনিয়া ৩৪৫ ভাগ, দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ ১৩৬৫ ভাগ, ভাসমান কঠিনপদার্থ ১৭৭ ভাগ, ফেনল ৩০.০ ভাগ, সি.ও.ডি. ৬৪০ ভাগ, সালফাইড ১০ ভাগ এবং

জৈব রাসায়নিক পদার্থ ১০ লক্ষ ভাগে ৭০০ ভাগ আছে। এই বিষাক্ত জল দামোদর ব্যারেজে গিয়ে জমা হচ্ছে। এই ব্যারেজের জলই হচ্ছে দুর্গাপুরে পানীয় ও কারখানায় কাজের জলের একমাত্র উৎস। যদিও ওয়াটার ট্রিটমেন্টের সাহায্যে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। কিন্তু তাতে ফেনলের মত বিষাক্ত রাসায়নিক শোধন করা যায় না। এক্ষেত্রে আরেকটি চমকপ্রদ সংবাদ হল দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার নিজস্ব শোধনাগার আছে, কোক চুল্লী কারখানার তরল আবর্জনা শোধন করা। কাগজে কলমে এই শোধনাগার থাকলেও বাস্তবে তার চিহ্ন নেই।

তাছাড়া বিষাক্ত এই নালার জলে অনেকে স্নান করে কাপড় কাচে। তাতে নানান অসুখ বিসুখ বাড়ে। বর্ষায় এই দুই নালার জল ছাপিয়ে পাশের পুকুরে বা কৃষি যোগ্য জমিতে জমা হয়। তাতে চাষের ক্ষতি হয়। স্বাস্থের ও ক্ষতি। কিন্তু এ নিয়ে সরকারের পক্ষে কোন সতর্কতা নেই।

৮৩ সালে রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিভাগের তৎকালীন সচিব কে. সি. শিবরামের নেতৃত্বে দুর্গাপুরে ৩ মে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে আছেন এই অঞ্চলের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ। তাঁরা এই অঞ্চলের ২০টি কারখানা বেছে নিয়ে এক সমীক্ষা রিপোর্ট দেন। রাজ্য পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার দুর্গাপুর শাখার কোন নিজস্ব রাসায়নিক পরীক্ষাগার নেই। সমস্ত কিছু পরীক্ষিত হয়েছে হিন্দুস্থান সার কারখানা ও ডি. পি. এলের গবেষণাগারে। প্রশ্ন উঠছে এই সমীক্ষা রিপোর্ট নিরপেক্ষ তো? কারণ যারা পরিবেশ দূষণ করছে তারাই যদি তাদের লাবরেটারীতে পরিবেশ দূষণের গবেষণা করে তবে তা কতখানি নিরপেক্ষ? তা সত্ত্বেও এই কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী দুর্গাপুর-রানীগঞ্জ-আসানসোলের কয়েকটি কারখানা কিভাবে পরিবেশ দূষণ করছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

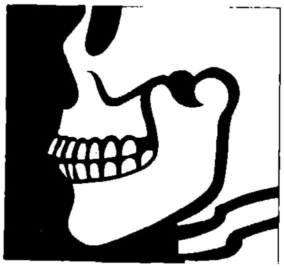

(১) হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া: এই কারখানায় এ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া সার উৎপাদন হয়। এজন্য কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় ন্যাপথা, কয়লা, ফারনেশ অয়েল, ডেট্রো কোক (পটাসিয়াম কার্বোনেট ও আর্সেনিক অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ)। এছাড়া হেক্সা মেটা ফসফেট ও সোডিয়াম বাই-ক্রোমেট।

এই কারখানা থেকে তামলা নালায় যে দূষিত বর্জ্য পদার্থ আসছে তাতে মোট এ্যামোনিয়া ১০ লক্ষ ভাগে ১৫১৩ ভাগ, আর্সেনিক ০.২ ভাগ, ক্রোমিয়াম ০.২৫ ভাগ, তেল জাতীয় পদার্থ ৩.৪, বি.ও.ডি. ৩.২ ভাগ, সি. ও. ডি. ২৪০ ভাগ এবং ভাসমান কণা ২০ ভাগ।

(২) দুর্গাপুর স্টেট ডেয়ারি: প্রধানত: দুধ উৎপাদন করে। কিন্তু এদের দূষিত বর্জ্য পদার্থের মধ্যে আছে হাইড্রোজেন আইয়ণ কনসেনট্রেশন (PH) ৫ ভাগ, টি. এস. এস. ৮৫৬ ভাগ, বি. ও. ডি. ৩১০ ভাগ, সি. ও. ডি. ১৯৮৬ ভাগ এবং তৈল পদার্থ ২৭৭ ভাগ।

(৩) এ সি সি ব্যাবকক লিমিটেড: অন্যান্য কারখানার বড় বড় ধাতব যন্ত্র তৈরি করে। কাঁচামাল হিসেবে প্রতিমাসে ব্যবহার করে রোল এণ্ড এ্যালয় স্টিল ৭০০ মেট্রিক টন, পিওর সালফিউরিক এ্যাসিড ০.৫ মেঃ টঃ, কোকওভেন গ্যাস ১,০০,০০০ ঘন মিটার, অক্সিজেন গ্যাস ৬,০০০ ঘন মিটার, এ্যাসিটিলিন গ্যাস ২,০০০ ঘন মিটার। এদের দূষিত বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ হল হাইড্রোজেন আইয়ণ কনসেনট্রেশন ৬.৪ ভাগ, টি. এস. এস. ১২০ মিলিগ্রাম, তৈল পদার্থ ১০.২ মিলিগ্রাম, বি. ও. ডি. ৪২ মিলিগ্রাম, সি. ও. ডি. ১৯৬ মিলিগ্রাম।

(৪) ফিলিপস্ কারবণ ব্লাক লিমিটেড: এরা কার্বণ ব্লাক তৈরি করে—যে গুলো টায়ার, টিউব, কেবল, কনভেয়ার বেল্ট ধরণের রাবার তৈরি করতে লাগে। এজন্য কাঁচামাল হিসেবে পেট্রোলিয়াম তেল ও আলকাতরা ব্যবহৃত হয়। এই কারখানা প্রতিদিন প্রায় ১২.৪ লক্ষ লিটার দূষিত জলীয় বর্জ্য পদার্থ ছাড়ে। এই বর্জ্য পদার্থে আছে, পি. এইচ ১০ লক্ষ ভাগে ৭.৩ ভাগ, তৈল পদার্থ ১২.৪ ভাগ, টি. এস. এস ১৭৩ ভাগ, বি. ও. ডি. ৬৮ ভাগ, সি. ও. ডি. ৮৩ ভাগ এবং ফেনল থাকে ০.৭৯ ভাগ।

(৫) ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিটিক্যাল ওয়াকার্স: দুর্গাপুরের এই কারখানায় আমাশা রোগের জন্য কুইনাইকো ক্লোর ও অন্যান্য ঔষধ তৈরি হয়। কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় ফেনল, ক্লোরিন গ্যাস, নাইট্রোক এ্যাসিড, হাইক্লোরিক এ্যাসিড, সালফিউরিক এ্যাসিড, গ্লিসারিণ ও আইওডিন। প্রতিদিন এরা প্রায় ৩৮৫ কিলো লিটার বর্জ্য পদার্থ ছাড়ে এতে থাকে পি. এইচ ১.৮ ভাগ, তৈল পদার্থ ৫৪.৪ ভাগ, টি. এস. ৩০৪ ভাগ এবং ফেনল ৫.৪ ভাগ।

(৬) দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড: রাজ্য সরকারের এই কারখানা বিদ্যুৎ ছাড়াও পরিশ্রুত পানীয় জল, কোক, বেনজিন, কোলটার, লাইট-অয়েল, কার্বোলিক অয়েল, ন্যাপথলিন অয়েল, পীচ প্রভৃতি তৈরি করে। সমীক্ষায় প্রকাশ এই কারখানায় কোন ওয়াশারির বর্জ্য পদার্থকে ঘন করার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন শোধনের ব্যবস্থা নেই। এই কারখানার কোক ওভেন, বাই প্রোডাক্ট প্লান এবং কোল ওয়াশারি প্লান্টের দূষিত বর্জ্য পদার্থ হল পি. এইচ ১০ লক্ষ ভাগে ৯.২৩ ভাগ, টি. ডি. এস. ২৯৮ ভাগ, বি.ও.ডি. ১৫ ভাগ, সি. ও. ডি. ১৯৪.৪ ভাগ, ফেনল ০.৫ ভাগ এবং টি. এস. এস. ৩৪০ ভাগ। পাওয়ার প্লান্ট থেকে দূষিত বর্জ্য পদার্থ হল যথাক্রমে ৭.৬ ভাগ, ৪৩৬ ভাগ, ১.৫ ভাগ, ৬৪ ভাগ এবং টি. এস. এ. ৪৬ ভাগ।

(৭) দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড: এই কারখানা সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড, তরল ক্লোরিণ, থ্যালিক হাইড্রাইড, ফেনল, মনোক্লোরোবেনজিন, পেণ্টাক্লোরিফাইজল, হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড, ডাই ফিনাইল অক্সাইড, তৈরি করে। কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে নুন, চুন, সোডিয়াম কার্বোনেট, বেরিয়াম কার্বোনেট, সালফিউরিক অ্যাসিড, ন্যাপথলিন ও বেঞ্জিন।

ফেনল প্লান্ট ছাড়া এই কারখানার সমস্ত দূষিত বর্জ্য পদার্থ কোন রকম সংশোধন ছাড়াই তামলা নালায় ফেলা হয়। এদের বর্জ্য পদার্থের মধ্যে পি. এইচ ১০ লক্ষ ভাগে ৫ ভাগ, বি. ও. ডি. ৮০ মিলিগ্রাম, সি.ও.ডি. ২৪০ মিলিগ্রাম, দ্রবীভূত মোট কণা ৯২০ মিলিগ্রাম, টি. এস. এস. ৩৯৯ মিলিগ্রাম এবং টি. ডি. এস. ৫২২ মিলিগ্রাম। এই বর্জ্যপদার্থের মধ্যে এ্যাসিড বেশি আছে। ক্লোর এ্যালকালি থেকে যা বেরোচ্ছে তাতে পারদের পরিমাণ প্রতি লিটারে ০.১২ মিলিগ্রাম। এই সমীক্ষায় এ কারখানা সম্পর্কে বলা হয়েছে

এ পরিমাণ পারদ অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিন্দুমাত্র কাল বিলম্ব না করে এর প্রতিরোধ করতে মন্তব্য করেছেন সমীক্ষকগণ। কিন্তু কে কার কথা শোনে!

দুর্গাপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশন ঃ এরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করলেও এদের 'এ্যাশ পন্ডের' প্রতি লিটার জলে ১০,০৩২ মিলি লিটার ছাই পদার্থ। এই ছাইয়ের বেশ কিছু পদার্থ দামোদরে মিশছে। এর ফলে ডি. পি. এলের জল শোধনাগারে অসুবিধা সৃষ্টি করছে।

মিশ্র ইস্পাত কারখানা ঃ এই কারখানায় দূষিত বর্জ্য পদার্থ মাপার কোন পরিমাপ যন্ত্র নেই। ফলে মোট বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ জানা না গেলেও এদের দূষিত বর্জ্য পদার্থের মধ্যে ছাই জাতীয় পদার্থ, ধাতব পদার্থ, ভাসমান পদার্থ ও তৈলজাত পদার্থ থাকে।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ঃ এই কারখানায় ইস্পাত ছাড়া বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে এ্যামোনিয়াম সালফেট, ক্রুডটার, বেঞ্জিন, টলুইন, জাইলিন, সলভেন্ট ন্যাপথা তৈরি করে। পাঁচটি নালা দিয়ে এই কারখানার দূষিত জল দামোদরে গিয়ে পড়ছে। ৫ নং ড্রেনেই দূষিত পদার্থ বেশি। এই ড্রেনে আছে পি. এইচ ১০ লক্ষ ভাগে ৪ ভাগ, টি. এস. এস. ৫০ ভাগ, তৈলজাত পদার্থ ৭৮.১ ভাগ, টি. ডি. এস. ১৫২ ভাগ, ফেনল ৬.৬ ভাগ, সাইনাইড ১.৩ ভাগ, বি.ও.ডি. ১০৪ ভাগ এবং সি. ও. ডি. ১২৪ ভাগ।

রানীগঞ্জ বেঙ্গল পেপার মিল ঃ দৈনিক ১৫০ টন কাগজ তৈরি করে। বর্তমানে বন্ধ। এদের বর্জ্য পদার্থে প্রচন্ড রকম কার্বণ থাকে। যা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এদের দূষিত বর্জ্য পদার্থের মধ্যে মন্ড তৈরির ইউনিট থেকে বেরোয় ১০ লক্ষ লিটার ভাগে বি.ও.ডি. ২১৫ মিলিগ্রাম, সি. ও. ডি. ৮২৯ ভাগ, টি.এস.এস. ১৪৮৪ ভাগ এবং টি.ডি.এস. ৩১০৮ মিলিলিটার।

দ্বিতীয়ত, মন্ড থেকে যেখানে কাগজ তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে দূষিত বর্জ্য পদার্থের মাত্রা হল বি.ও.ডি. ১০ লক্ষ ভাগে ১৫৪.১৬১ ভাগ, সি. ও. ডি. ৩৫৯.৫২৭ ভাগ, টি.এস.এস. ৪২১.৬৬৪ ভাগ এবং টি.ডি.এস. ১৩২৮.১৯২৩ ভাগ।

শিবপুর পাওয়ার স্টেশন, জামুড়িয়া ঃ এখানে ৪.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুত তৈরি হয়। তিনটি ইউনিট আছে। এখান থেকে প্রতিদিন ১৯০ কোটি লিটার জলীয় দূষিত বর্জ্য পদার্থ ছাড়া হয়। এখানে এই সব বর্জ্য পদার্থ সংশোধনের কোন ব্যবস্থা নেই। এই বর্জ্য পদার্থে আছে পি. এইচ ১০ লক্ষ ভাগে ৯.৬ ভাগ, টি. এস. এস. ৮১০ ভাগ, বি.ও.ডি. ২৫ ভাগ এবং তৈল পদার্থ ২ ভাগ।

রেকিট কোলম্যান অব ইন্ডিয়া লিমিটেড, আসানসোলঃ রেল স্টেশনের কাছে নুজিয়া নালার বাঁ দিকে এই কারখানা প্রতিমাসে ৩০০

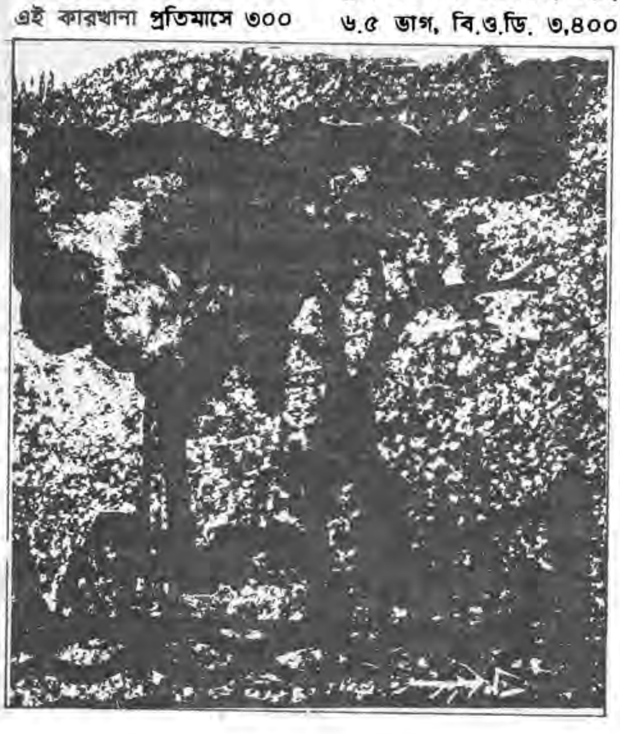

মেট্রিক টন আলট্রামেরিন নীল তৈরি করে। এখানে ব্যবহৃত হয় চায়না ক্লে, সালফার, সোডা এ্যাশ, সিলিকা ও পীচ। এদের দূষিত বর্জ্য পদার্থ হল টি.এস.এস. ১০ লক্ষ ভাগে ১২৪ ভাগ, সি. ও. ডি. ৩৮১.৬ ভাগ এবং বি. ও. ডি. ১২৪ ভাগ।

কেরু এন্ড কোম্পানি, আসানসোল ঃ এখানে বিভিন্ন ধরণের মদ তৈরি হয়। এখানে দুটি বড় জলাধার রয়েছে, যাতে দূষিত বর্জ্য পদার্থ সংশোধিত করার কথা। কিন্তু এই জলাধারগুলি বাঁধানো নয়। ফলে দূষিত জল বেরিয়ে এসে মাটির নিচে যে জলের স্তর থাকে তাকে দূষিত করছে। এই দূষিত পদার্থের পরিমাণ হল প্রতি ১০ লক্ষ ভাগে পি. এইচ. ৬.৫ ভাগ, বি.ও.ডি. ৩,৪০০ ভাগ, সি. ও. ডি. ১৬,৫০০ ভাগ, টি. এস. এস. ১,০৬০ ভাগ এবং টি. ডি. এস. ১৩,৭০০ ভাগ।

ইন্ডিয়ান আয়রন এন্ড স্টীল কোং, বার্ণপুর ঃ এখানকার দূষিত জল কোন রকম সংশোধন ছাড়াই সামডি গ্রামের কাছে দামোদরে নদে পড়ছে। কোক ওভেন প্লান্ট থেকে যে জল দামোদরে মেশে তা অবশ্য কিছু সংশোধিত। এই কারখানার সীমানার বাইরে শুধুমাত্র দূষিত বর্জ্য পদার্থের মধ্যে আছে পি. এইচ. ৭.৫ ভাগ, বি.ও.ডি. ১৮০ ভাগ, সি. ও. ডি. ৩৫০ ভাগ, ফেনল ২.৫ ভাগ, এ্যামোনিয়া ১৮০ ভাগ, টি. এস. এস. ১২০ ভাগ এবং টি. ডি. এস ৭১ ভাগ।

ইন্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেড, আসানসোল ঃ এখানে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, আরগণ, এসিটিলিন তৈরির চারটি প্লান্ট আছে। এ সংস্থায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় কস্টিক সোডা, ক্যালসিয়াম কারবাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, এ্যালুমিনা, প্যালেডিয়াম ক্লোরাইড ও এ্যাসিটিন। এদের দূষিত বর্জ্য পদার্থের মধ্যে আছে পি. এইচ. ১২.১ ভাগ, টি. এস. এস. ২০০ ভাগ, বি.ও.ডি. ৩৮ ভাগ, সি. ও. ডি. ১২১ ভাগ রাসায়নিক পদার্থ।

কন্যাপুর সাইকেল কারখানা দূষিত বর্জ্য পদার্থের মধ্যে সায়নাইড ০.৮৬ মিলিগ্রাম ছাড়লেও ডিসেরগড় পাওয়ার প্লান্টের দামোদরের জল দূষণ করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা নেই বলে স্বীকার করা যায়।

এতক্ষণ ধরে যে কারখানাগুলির কথা বলা হল এছাড়া আরো প্রায় ৩০/৪০টি ছোট খাট কারখানার দূষিত জল দামোদরে পড়ছে। দামোদর ক্রমেই হয়ে উঠছে বিষাক্ত এক নদ। □

হত্যার রসায়ন

বিশ শতকের শুরু থেকে যুদ্ধে রাসায়নিক মারণাস্ত্র ব্যবহারের জন্ম। খুব তাড়াতাড়ি খুব একটা হৈ হট্টগোল না করে অনেক লোক মেরে ফেলবার পদ্ধতি হিসেবে বিজ্ঞানীরা এগুলো আবিষ্কার করেছেন। ফরাসীরা ১৯১৪ সালে প্রথম যুদ্ধে 'সায়ানোজেন ক্লোরাইড' ব্যবহার করে। '১৫ সালে জর্মনরা ব্যবহার করলো ফসজিন, এবং '১৭তে ইপেরাইট ও মাস্টার্ড গ্যাস। ভিয়েতনাম যুদ্ধে বেশ কয়েকবার আমেরিকা, 'বন-জঙ্গল সাফ করছি' এই অজুহাতে এই সব রাসায়নিক গ্যাস ব্যবহার করেছে। ইদানীং কালে আফগানিস্থানে রাশিয়ান সৈন্য বাহিনী রাসায়নিক গ্যাস ব্যবহার করেছে এমন অভিযোগ কোন কোন মহল থেকে উঠেছে। তবে এখনও তা প্রকাশ হয়নি।

যুদ্ধে যে সমস্ত রাসায়নিক গ্যাস ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে বা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল।

বাণিজ্যিক নাম	মার্কিন সেনাবাহিনীর 'কোড' নাম	কি ভাবে ব্যবহৃত হয়	উপসর্গ
ফসজিন	সি জি	গ্যাস	কাশি, বমি, শ্বাসরোধ।
প্রুসিক এসিড	এ সি	গ্যাস	খিচুনি, সংগা হারান, শ্বাসরোধ।
সায়ানোজেন ক্লোরাইড	x	গ্যাস	শ্বাসরোধ।
টপেরাইট	x	তরল/গ্যাস	চোখে জ্বালা এবং ঘা হওয়া; চামড়ায় গুটি ওঠা, কোষের গঠন, আকৃতি নষ্ট হয়ে যাওয়া, শ্বাসরোধ, নিউমনিয়া, ফুসফুস-কোষের ধ্বংস।
নাইট্রোজেন মাস্টার্ড	এইচ এন-৩	তরল/গ্যাস	আগের মতই।
ক্লোর এসিটোফেনন	সি এন	গ্যাস	(আন্দোলন দমনে ব্যবহৃত হয়) গা হাত পা জ্বালা করা, চোখ দিয়ে জল পড়া, বেশি গাঢ়ত্বে মৃত্যু হতে পারে।
এডামসাইট	ডি এম	গুড়ো	ক্লান্তি, মাথাধরা, কাশি, বমি, গলা ও নাকের শ্লেষ্মা ও ঝিল্লিতে প্রতিক্রিয়া।
বি জেড	বি জেড	গ্যাস	দৈহিক ও মানসিক শৈথিল্য, মানসিক বৈকল্য, অপ্রকৃতিস্থতা।

ভিয়েতনামে যেসব রাসায়নিক গ্যাস আমেরিকা ব্যবহার করছে।

ট্রিলন	জি এ	তরল/গ্যাস	চোখে দেখতে না পাওয়া, শ্বাসরোধ, বমি, খিচুনি, সংগাহীন, অবশেষে মৃত্যু।
সারিন	জি বি	তরল/গ্যাস	আগের মতই।
সোমান	জি ডি	তরল/গ্যাস	আগের মতই।
মিথাইল-এম	ডি এক্স		আগের মতই।
২-৪ ডাইক্লোর ফেনকিস এসিটিক এসিডের এন-বিউটাইল এস্টার	২-৪ ডি	ছড়িয়ে দেওয়া হয়	কোষের ক্রোমজমে পরিবর্তন, বিকলাঙ্গ সন্তান, বা গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু।
২,৪,৫ ট্রাই ক্লোর ফেনকিস এসিটিক এসিডের এন-বিউটাইল এস্টার	২-৪-৫ টি	ছড়িয়ে দেওয়া হয়	আগের মতই।
৪ এমিনো ৩,৪,৬ টাইক্লোর পিকলিনিক এসিড	পিকলোরাস	ছড়ান হয়	x
৩,৬ সোডিয়াম এন্ডোকেমা-হেক্সা হাইড্রোথ্যালেট	২,৪ ডি.এন.পি.	ছড়ান হয়	x

জমি অনুর্বর করে দেবার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজনে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেছেন

৪,৬ ডাই নাইট্র-২-মিথাইল ফেনল	ডি.এন.ও.সি	ছড়ান হয়
এন-ক্লোর-৪, ফিনাইল এন, এন ডাইমিথাইল ইউরিয়া	সি.এম.ইউ	
ব্রোম-৫, বিউটাইল-৩, মিথাইল-৬, ইউরেসিল	ব্রোমাসিল	ছড়ান হয়

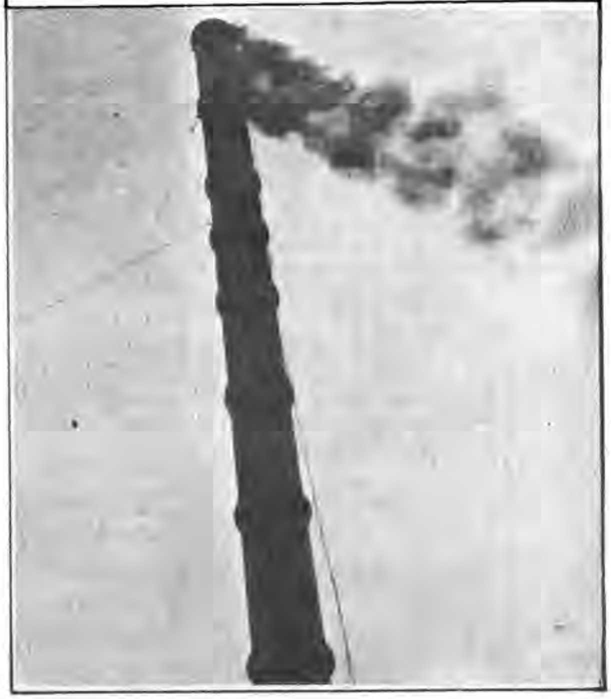

এখন রোজ জিতুন
টিকিট:
নূ/টা ১ মাত্র
ড্র: ২৬.১.৮৫
থেকে দৈনিক
ভূটান লক্ষ্মী
দৈনিক লটারী
প্রথম পুরস্কার :
Nu/Rs. 1 lakh
দৈনিক মোট পুরস্কার সংখ্যা ৪৪২০৬
পুরস্কারের টাকা থেকে আয়কর কাটা হয়না
রোজ কিনুন রোজ জিতুন
ডিরেক্টরেট অফ্ লটারীস
রয়্যাল গভঃ অফ্ ভূটান
ফুন্টসিলিং
অর্গ্যানাইজিং এজেন্ট
মনিয়ান এজেন্সি
৯ লেডি দেসিকা রোড
মাদ্রাজ। ফোনঃ ৭৩৭২৫
সব জায়গায় টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। আজই কিনুন

'সেকাল ও একালে খুচরো পয়সার আকাল'

অশোক সেনগুপ্ত

বাস-ট্রাম, দোকান, বাজার—খুচরো পয়সা নিয়ে বাগবিতন্ডা আজকাল লেগে আছে প্রায় সর্বত্র, খুচরো পয়সার জন্ম কবে সেটি সঠিকভাবে জানা না গেলেও এটি সকলেই জানেন, পয়সার জন্মের আগে বেচাকেনার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত কড়ি। এই কারণেই 'ফেল কড়ি মাখো তেল', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'গাঁটের কড়ি দিয়ে মদ খাই, লোকে বলে মাতাল'– এধরনের নানা কথা নানা সময়ে শোনা যেত। ধীরে ধীরে জিনিসের দাম বাড়তে থাকায় সমাজে পয়সার আবির্ভাব হয়।

খুচরো পয়সার চরম আকাল সেকালেও দেখা গিয়েছিল, ১৮২৯ সালের ১৮ এপ্রিল 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় এই আকালের সংবাদ প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় লেখা হয়েছিল–"পয়সার অপ্রাপ্যতা প্রযুক্ত দীন দু:খিদিগের অতিশয় ক্ষতি হয় অর্থাৎ এক টাকায় প্রায় তিন পয়সা বাট্টা যায়। এই দু:খ নিবারণ-হেতুক শুনা যাইতেছে যে গবরনমেন্টের আজ্ঞায় নতুন পয়সা বাহির হইবে। শুনা গিয়াছে যে এ পয়সা রাঙেগতে নির্মিত হইবে এবং কড়ি ও পয়সার পরিবর্তে এই পয়সা চলিবে।" সেকালেও একালের মত খুচরো পয়সার অসম বিতরণ পয়সার আকালের অন্যতম কারণ। ১৮৬২ সালের ৫মে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় দেখা যায়," টাঁকশালের কর্মচারিরা পুরাতন পোদ্দারদিগকে পয়সা না দিয়া নূতন লোকদিগকে দিতেছেন। গবর্ণমেন্টের আজ্ঞার বিরুদ্ধে কাজ করা টাঁকশালের অধ্যক্ষেরা গৌরবের বিষয় জ্ঞান করেন।"

খুচরো পয়সা নিয়ে নানা জায়গায় কালোবাজারি চলছে রমরম করে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছোট ছোট দোকানদার বা ব্যবসায়ীরা। শতকরা ১৫ বা ২০ টাকা বাট্টা দিয়ে খুচরোর কারবার করার জন্য কেউ কেউ পয়সা মজুত করছে। ১৮৬২ সালের ১৪ এপ্রিল, মানে আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে 'সোমপ্রকাশ'ও এধরনের একটা খবর পাঠকদের উপহার দিয়েছিল। 'সোমপ্রকাশ' লিখেছিল, "বড়বাজারের একজন মাড়োয়ারি এককালে টাঁকশালের সমুদায় পয়সা ক্রয় করিয়াছেন।"

খুচরো পয়সার এই সাম্প্রতিক আকালকে মোকাবিলা করার জন্য বাসে ট্রামে ব্যবহৃত হচ্ছে কুপন। বহু দোকান বা রেস্তোঁরাও এ পথে পা বাড়িয়েছেন। খুচরো পয়সার অভাবের অন্যতম কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি। ১৯৭৬ সালে বোম্বে ও কলকাতা মিন্ট থেকে উৎপাদন করা হয়েছিল যথাক্রমে ৩৩ কোটি ও ৯৬ কোটি পিস মুদ্রা। ১৯৮১ সালে সংখ্যাটা কমে দাঁড়ায় ২১ কোটি ৫০ লক্ষ পিস। নিচের তালিকা থেকে তুলনামূলক বিচারটা ভালভাবে বোঝা যায়: সাল

'৭৪-'৭৫	'৮২-'৮৩
৫প: ২০ কোটি	২ কোটি
১০প: ৪০ কোটি	৯ কোটি
২৫প: ১৫ কোটি	১ কোটি
৫০প: ৮ কোটি	০.৫ কোটি

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কম মূল্যের নোট ছাপানোও হঠাৎ কমে গিয়েছে। ১৯৭৯ সালে কলকাতার অফিস থেকে ছাড়া হয়েছিল এক ও দু টাকার নোট যথাক্রমে ৯.৯ কোটি ও ১৪ কোটি টাকার। ১৯৮৩ সালে এই দুটি সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২.৬ কোটি ও ৪.৩ কোটি টাকার। '৭৯ সালের প্রথম ৪ মাসে ১ টাকার নোট ছাড়া হয়েছিল ৪ কোটি ২৯ লক্ষ পিস কিন্তু '৮৪ সালের প্রথম চার মাসে ১ টাকার নোট ছাড়া হয়েছে ৭৮ লক্ষ পিস। স্বাভাবিকভাবেই নোট ছাপানোর এই স্বল্পতা খুচরো পয়সার সাম্প্রতিক সমস্যাকে আরো ঘনীভূত করেছে।

সমস্যার কারণ খুঁজতে আরো গভীরে গেলে দেখা যায় বাজারের খুচরো পয়সার শতকরা চল্লিশ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে একদল অসাধু ব্যবসায়ী। ব্যাঙ্কের কিছু কর্মচারির সঙেগ তাদের গোপন যোগাযোগ রয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও মিন্ট কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই সমস্যার জন্য একে অপরকে দোষারোপ করে চলেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মচারি সমিতি এই সমস্যার জন্য সরাসরি দায়ী করেছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতিকে।

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে খোদ কলকাতা শহরেই বিভিন্ন মন্দিরে এবং রাস্তার আনাচে কানাচে যেসব দেবদেবী রয়েছেন তাঁদের প্রণামীর থালায় মোট রোজ দু লক্ষ থেকে তিন লক্ষ টাকার খুচরো জমা হয়। সেই বিপুল পরিমাণ খুচরো পয়সা সরকারি ভাঁড়ারে না গিয়ে প্রবাহিত হয় অন্য এক খাতে। এ ছাড়াও দেখা গিয়েছে, ২৫ টাকা মূল্যের খুচরো পয়সা (২৫, ১০ এবং ৫ পয়সা) তৈরি করতে খরচ পড়ে ৪০ টাকা। পয়সা তৈরির ধাতু ব্যবহার করা হচ্ছে অন্যান্য শিল্পোৎপাদনের কাজে। ব্যয়সাপেক্ষ বলে দু টাকার এবং ২০ পয়সার মুদ্রা এখন আর তৈরি করা হচ্ছে না। টাকার মূল্য কমে যাওয়ায় ১, ২ বা ৩ পয়সার মুদ্রার উৎপাদনও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবু মুদ্রাসঙ্কটের কোন সুরাহা হয়নি।

খুচরো পয়সার অভাবের আরেকটি বড় কারণ কলকাতা মিন্টের পুরোনো যন্ত্রপাতি ও সেকেলে কার্যপদ্ধতি। ১৯৮১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতার মিন্টকে একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার আবেদন জানায়। এতে বলা হয়েছিল, সপ্তাহে শ্রমিকরা ৪৪ ঘণ্টার বদলে কাজ করবে ৫৪ ঘণ্টা এবং প্রতিদিন ২.৬ মিলিয়ন মুদ্রার বদলে উৎপাদন করবে ৩.৫ মিলিয়ন মুদ্রা। এর বদলে যাদের বেতন ১৯৬ টাকা থেকে ৬৪০ টাকার মধ্যে তাদের বেতনবৃদ্ধি হবে ১৫৬ টাকা ৫৫ পয়সা থেকে ৪৩৮ টাকা ৯০ পয়সা পর্যন্ত। কিন্তু ইউনিয়ন দাবি জানিয়েছিল তাদের কর্মীসংখ্যা ১৭০০ থেকে বাড়িয়ে ২০০০ করার জন্য। লক্ষ্য করা গিয়েছে বোম্বাই বা হায়দরাবাদের উৎপাদনের হার কলকাতা মিন্টের উৎপাদনের হারের থেকে অনেক বেশি।

খুচরো পয়সার চরম অভাব বেশ কিছুদিন ধরেই কলকাতাবাসীকে কাবু করে রেখেছে। সব দেখে এই সিদ্ধান্তে সহজেই আসা যায়, যারা এই সমস্যাকে জিইয়ে রেখেছে তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করার ক্ষমতা সরকারের নেই। অধিক পয়সা উৎপাদন করে সরকার কিভাবে সমস্যাটা দূর করেন, সেটা দেখার জন্য আমরা উদগ্রীব। □

সুভাষ মেলা

একগণ্ডা জেনারেটর

শুভ্রা মুখোপাধ্যায়

পূর্ব কলকাতার মানচিত্রে যে অংশে বিধান শিশু উদ্যানের ঠাঁই, তার খুব কাছেই এক মাসের জন্য হলেও প্রতি বছর আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে যার নাম সুভাষ মেলা। ২৩ জানুয়ারি থেকে এক মাস এই মেলা ওই এলাকার মানুষদের টানে চুম্বকের মতন। বিধান শিশু উদ্যানের মতন এখানেও প্রবেশ মূল্য নেই। ছুটির দিন পনের-বিশ হাজার মানুষও মেলায় ভিড় করেন। এই মেলার দৌলতে সি আই টি একটি পার্কের নাম করনের ফুরসত পাননি। জনগণই নাম দিয়েছেন সুভাষ পার্ক।

বিধান শিশু উদ্যানের সঙ্গে অবশ্য কোনমতেই সুভাষ মেলার তুলনা হয়না। তুলনা হয়না দুই সংগঠকের মধ্যেও। অতুল্য ঘোষ এ রাজ্যের প্রথম সারির নেতা। তাঁর পিছনে অর্থ বল রাজশক্তি এবং সংবাদপত্রের তাকত সর্বদা হাজির। সে তুলনায় পরেশ পাল একেবারেই সাদামাটা। পিছনের সারির অজ্ঞাত। অখ্যাত এক কর্মী। মেলা কমিটি অনেক ছবি তুলেছেন। খুঁটিয়ে দেখেছি, একেটিতেও পরেশ পালের ছবি নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামী হীরেন বসু এবং যুবকংগ্রেস নেতা বীরেন মহান্তির প্রয়াণ তাঁকে আরো দুর্বল করে দিয়েছে। তবে পিছিয়ে পড়ার পাত্র নন পরেশ। এবারের আয়োজনে কিছু ঘাটতি নেই।

কিন্তু বাধা অনেক। মেলা যখন জমজমাট হয়, ঠিক তখনই দপ করে সব আলো নিভে যায়। সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত দশটা অবধি এলাকাটি অনেকটা নিয়ম করেই নিষ্প্রদীপ থাকছে। প্রজাতন্ত্র দিবসেও একই হাল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী এবং এলাকার অন্যান্য বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিরা সি ই এস সির কাছে আবেদন জানিয়ে ছিলেন সুভাষ মেলাকে অন্ততঃপক্ষে সন্ধ্যের পর লোডশেডিং থেকে অব্যাহতি দিতে। সে আবেদনে ওঁরা কর্ণপাত করেননি। বাধ্য হয়েই পরেশ পাল সুভাষ মেলায় জেনারেটারের সাব-মেলা বসিয়েছেন। এক গণ্ডা জেনারেটারের দাপাদাপির শব্দ মেলাটির ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যপাল ২৩ জানুয়ারি মেলাটির উদ্বোধন করেন। তিনি চলে যেতেই সকল আলোর জ্যোতি নিভে যায়। গত বছর রাজ্যপাল এ. পি. শর্মা বক্তৃতা করতে উঠলেই এলাকাটিতে অন্ধকার নেমে আসে। তারমধ্যেই একটি হাতি তাঁকে মালা পরিয়ে দেয়। সার্কাসের হাতি, দেখা গেল, সেও লোডশেডিং রপ্ত করে ফেলেছে। কাঁকুড়গাছির পরেশ পাল কখনই কেউকেটা নন। কিন্তু নেতাজির নামে অনুষ্ঠান করা তাঁর অনেকদিনের প্যাশান। ছোটবেলা থেকেই ২৩ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠান করছেন। সেই অনুষ্ঠানই ধীরে ধীরে বড় হয়েছে। কাঁকুড়গাছি পোস্ট অফিসের পাশে মেলা বসেছে ১৯৭১ অবধি। '৭২ থেকেই মাণিকতলা মেন রোড আর ডি. আই. পি. রোডের (হবু নাম আচার্য সত্যেন বসু সরণি) মোড়ের কাছে সি আই টি পার্ক, এখন যার নাম সুভাষ পার্ক, সেখানেই মেলা বসছে। এলাকাটা একেবারেই নতুন। কয়েক যুগ আগেও প্রায় পাড়াগাঁ ছিল। ট্রেনে যাওয়া আসার সময় দেখা যেত, পুকুরের মিছিল বসেছে। সকল পুকুরেই ধোবীদের প্রাধান্য। বস্তিতে ঠাসা এলাকাটিতে নাম করার মতন ছিল শুধু বাগমারি কবরস্থান। সি আই টি ওখানকার মানুষদের ভিটেছাড়া করে নতুন করে গড়ে তোলেন এলাকাটি। পুরাতনের মধ্যে আছে শুধু কবরখানাটি। নতুন করে গড়ে উঠেছে এক দঙ্গল হাউসিং এস্টেট আর বিত্তবানদের, যাঁদের মধ্যে মাড়ওয়াড়িদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। ই এস আই হাসপাতালের সাততলা বাড়ি এই এলাকাতেই। নেতাজি মেলায় অবশ্য আসেন বাগমারি, মুরারীপুকুর, নারকেলডাঙ্গা, বেলেঘাটা, কাদাপাড়া —এমনকি লবনহ্রদ, লেকটাউনের লোকজনও।

এবারও একশটি স্টল হয়েছে। ইন্দিরা ভবন এবং নেতাজি ভবনে দুই নেতাকে নতুন ভাবে দেখা যাবে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক-একজনের মূর্তি করে এক-একবার ওঁরা পুজো দেন। বিনয় বাদল দীনেশ, ঝাঁসীর রানি, ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনি প্রমুখের পর এবার এসেছেন নেতাজি এবং ইন্দিরাজি। শিশুদের জন্য চরকি, নাগরদোলা ও ঘোড়াদোলা, বড়দের জন্য যাত্রা, থিয়েটার এবং সিনেমা – মানুষ টানার আরো রকমারি ব্যবস্থা আছে।

সব থেকে বড় কথা এতবড় মেলার যাঁরা আয়োজন করেছেন, তাঁরা সবাই যুবক। সুভাষ মেলার কর্মীরা এসেছেন ভারত মিলন, সব পেয়েছির আসর, সি আই টি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশান, সুভাষ সংঘ, অভিযান প্রভৃতি সংগঠন থেকে। এরা সবাই কচি এবং কাঁচা। এরাই মেলাটাকে সজীব করে রাখেন। সভাপতি সোমেন মিত্র এবং কার্যকরী সভাপতি সাংবাদিক মহেন্দ্র চক্রবর্তীকে বাদ দিলে আর এমন কেউ নেই যাঁকে লোকে এক ডাকে চেনে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিকে সম্প্রতি অনেকেই চিনে ফেলেছেন। কিন্তু এ অঞ্চলে সুবিমল মিত্রকে কেউ চেনেন না। চেনেন খোকন মিত্রকে। □

সদ্য প্রকাশিত

হান্টার প্রণীত

গ্রাম বাংলার ইতিকথা ৪৫.০০

ভাষান্তর –অসীম চট্টোপাধ্যায়

বিবর্তনের কথা ২০.০০

অলোক মুখোপাধ্যায়

অন্যান্য গ্রন্থঃ

জলসাঘর।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬.০০

শরৎ-কণিকা।
ফণীভূষণ রায় ১৮.০০

নীলকর বিদ্রোহ।
সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় ১৬.০০

শ্রীরামকৃষ্ণ নৈঃশব্দের রূপ।
ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৫.০০

সুবর্ণরেখা

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা ৯
ও
পোঃ শান্তিনিকেতন, জেলাঃ বীরভূম

ধারাবাহিক

মরজি মহল

বনফুল

।। ১৬ জুন ১৯৭৫ ।।

আজকাল আনন্দবাজার পত্রিকা সংবাদপত্র নয়, বিজ্ঞাপন পত্র। বেশীর ভাগই বিজ্ঞাপন। যেটুকু খবর ছাপা হয় তা-ও সুপাঠ্য নয়। খবরের কাগজ হিসাবে স্টেটস্‌ম্যান-ই এখন বেশী নির্ভরযোগ্য। এককালে এ কাগজ আমাদের শত্রুপক্ষের কাগজ ছিল। এখন তাদের বিষদাঁত ভেঙে গেছে। কিন্তু এখনও একটু একটু ট্যাঁশ গন্ধ পাই মাঝে মাঝে। আজকের খবর ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকবেন কি না, থাকা সম্ভব কিনা—এইসব নিয়ে। দেবকান্ত বড়ুয়া বলেছেন—legal, moral,এবং political তিনদিক দিয়েই ইন্দিরাজীর প্রধানমন্ত্রীত্ব সমর্থন যোগ্য। গুজব উঠছে প্রধানমন্ত্রীকে যদি সামরিকভাবে কাজে ইস্তফা দিতেই হয় সিদ্ধার্থশঙ্কর প্রধানমন্ত্রী হবেন। শ্রী বিজয় নাহারও ট্রাঙ্ককল পেয়ে দিল্লী গেছেন। রাষ্ট্রপতি ফিরে এসেছেন কাশ্মীর থেকে। খেলা বেশ জমে উঠেছে। আমি কখনও ইন্দিরাজীকে দেখি নি, তার মতের সঙ্গে অনেক জায়গায় আমার মতের মিল নেই, আমি জানি তাঁর নানা দোষ আছে কিন্তু তবু আমি তাঁকে ভালবাসি তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য। আমি বিশ্বাস করি বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার উপযুক্ত লোক তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। কোনও নৈতিক গুণের জন্য ঈগলকে ভালবাসি না, ঈগল ঈগল বলেই তাকে ভালো লাগে।

।। ১৭ জুন ১৯৭৫ ।।

কাল সাহিত্যতীর্থে আমাকে কেন্দ্র করে একটি অনুষ্ঠান হল—'বনফুল বৈকালী'। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সভাপতিত্ব করেছিলেন। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন উদ্বোধক। প্রধান অতিথি সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন আশাপূর্ণা দেবী। ডঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় আমার উপন্যাস সম্বন্ধে একটি চমৎকার ভাষণ দিলেন। আরোও অনেকেই আমার সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কথা বললেন। আমার কয়েকটি গানে সুর দিয়ে গাইলেন একজন। অনেক মালা এবং কিছু বই পাওয়া গেল। আমিও শেষে বললাম ২/৪ কথা। দুঃখ হচ্ছিল লীলা সে সভায় যেতে পারে নি। আর এসব বিষয়ে তারই উৎসাহ সব চেয়ে বেশী। সে কবে সেরে উঠবে?

কাল ১লা আষাঢ় ছিল, কিন্তু এক ফোঁটা বৃষ্টি হয় নি। আজ সকাল থেকেই বৃষ্টি নেমেছে। মনে হচ্ছে বর্ষা এসে গেল।

কাগজে শ্রীমতী গান্ধীকে নিয়ে কচলা কচলি চলছে। অনেকে বলছেন তিনি বে-আইনী ভাবে গদি দখল করে আছেন। কিন্তু আছেন তো। শেষ পর্যন্তও থাকবেন বলে মনে হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্ট তাঁকে যে দোষে দোষী সাব্যস্ত করেছেন সে দোষে কে দায়ী নয়?

আলকাতরা নিয়ে যারাই ঘাঁটাঘাটি করেন তাদের সকলেরই গায়ে আলকাতরা লাগে।

।। ১৮ জুন ১৯৭৫ ।।

কালকের বর্ষার জের আজও চলছে। এখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। একটা দর্জি পাখী খুব ডাকাডাকি করছে। বোধহয় বৃষ্টিতে তার বাসার ক্ষতি হয়েছে। প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সুরট্টা রাগী রাগী। কাগজে দেখলাম অনেক বিদেশী কাগজ ইন্দিরার উচ্চপ্রশংসা করে লিখেছেন যে ইন্দিরাজী যা করেছেন—তা সবাই করেন—তা একটা প্রচলিত প্রথা বললেও চলে। তার মতে watergate কেলেঙ্কারীর তুলনা হাস্যকর। প্রধানমন্ত্রী হবার মতো যোগ্য লোক ভারতবর্ষে এখন একজনও নেই ইন্দিরার সমতুল্য। হাইকোর্টের জজ্ সাহেব কি করে এটা ভুললেন। এই রকম সব নানা কাগজ নানা কথা লিখেছে। নেহরু যখন বেঁচে ছিলেন তখন সকলের আশঙ্কা হয়েছিল নেহরু মারা গেলে আমাদের কি দশা হবে। কিন্তু নেহরুর পর লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং তারপর ইন্দিরাজীকে আমরা পেয়েছি। সুতরাং ইন্দিরাজী না থাকলে যোগ্য প্রধানমন্ত্রী এদেশে একেবারে দুর্লভ হবে তা মনে করি না।

এক রাজা যাবে পুন অন্য রাজা হবে
ভারতের সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।
কবির এই কথাই সত্য।

।। ১৯ জুন ১৯৭৫ ।।

এসে গেল বর্ষা এবার।
কলকাতা শহরে বসে আছি
যে পাড়ায় আছি
সে পাড়ায় ব্যাং আছে
ময়ূর নেই। ডাহুক নেই।
চাতক একদিন এসেছিল

আর দেখছি না তাকে।
আকাশের মেঘ দেখতে পাচ্ছি
জানলা দিয়ে জলের ছাট আসছে।
ছাতে কাপড় শুকুচ্ছে না।
কলে জল ছিল না
এখন একটু একটু আসছে।
রাস্তার চারদিকে গর্ত আর গাড্ডা
তাতে জল জমছে
কাদা ছিটিয়ে মোটর ছুটছে
এইবার আশা করছি
কিছুদিন পরেই বন্যার খবর ছাপা হবে।
খরা বন্যা
রাজনীতি, রাহাজানি
মোটর দুর্ঘটনা, ট্রেন দুর্ঘটনা
আর নানারকম চুরি।
এইসব নিয়ে আমাদের কাগজগুলো
ক্রমাগত ধুনে যাচ্ছে বস্তা–পচা তুলো
এই বর্ষাতেও ধুনবে—
অনেকে দেখবে, অনেকে শুনবে
নানা ক্যাম্প থেকে উদ্বাস্তুরা দলে দলে পালাচ্ছে
কর্তৃপক্ষ পালাতে দেবে না
উদ্বাস্তুরা মানুষ, না জানোয়ার?

।। ২০ জুন ১৯৭৫।।

আপীল করবার পর সুপ্রীম কোর্ট শ্রীমতী গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী রূপে কাজ করতে দেবেন কি না এই নিয়ে অনেকেরই মাথার ঘাম ঝরছে। মিটিংয়ের পর মিটিংয়ে ঘোষিত হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী নইলে আমাদের চলবে না। আমাদের জীবনের প্রতি স্তরে যে দুর্নীতি জমেছে তার জন্যে কে দায়ী? আমরাই দায়ী। আমরা দুর্নীতি চাই তাই দুর্নীতি টিকে আছে। যেদিন চাইব না সেদিন থাকবে না। শুধু এ দেশে নয়, সব দেশেই ওটা আছে কিছু কিছু। এ নিয়ে হইচই করে যারা শ্রীমতী গান্ধীকে হাটাতে চাইছেন তারা সুনীতির উপাসক নন, তাঁরা মতলববাজ ক্ষমতা–লোভী। ইন্দিরার ঐতিহ্য তাঁদের নেই, ইন্দিরার মতো বুদ্ধিও তাঁদের নেই। তাই মনে হয় শেষ পর্যন্ত তারা হারবেন। শক্তিই শেষ পর্যন্ত জেতে।

আষাঢ় বেশ নেবে গেছে।
সকাল থেকে সূর্য্যের দেখা নেই।
কাকেরা আলসের কাছে
ভিজে বসে আছে ছাতা নেই।

।। ২১ জুন ১৯৭৫।।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পদত্যাগ করবেন কি না তা ঠিক করবে আদালত। জনতার মিছিল বা মন্ত্রীদের সভা নয়। শ্রীমতী গান্ধী দেশের পক্ষে যদি অপরিহার্য্যও হন আর আদালত যদি তাঁকে গদি ছাড়তে আদেশ দেয় তবু তাঁকে গদি ছাড়তে হবে। গণতান্ত্রিক দেশে এইটেই নিয়ম।

শ্রীমতী গান্ধী আপীল করেছেন, আপীলের পয়েন্টগুলি বেশ জোরালো মনে হল, তিনি সুপ্রীম কোর্টের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন সুপ্রীম কোর্ট তাঁকে শেষ রায় বার না হওয়া পর্যন্ত যেন প্রধানমন্ত্রীরূপে থাকতে দেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারের উপরই সব নির্ভর করছে।

শ্রীমতী গান্ধীকে ঘিরে তাঁর ভক্তের দলে যে 'হিস্টিরিয়া' জেগেছে তা হাস্যকর এবং অর্থহীন। ওসবে ভাল লাগবে না। চিঁড়েও ভিজবে না। এদেশে ভক্ত দুরকম হয়—দুরকম নয়, তিন রকম।

(১) প্রকৃত ভক্ত: তারা দূরে থাকে: বেশী হাল্লা করে না।

(২) স্বার্থপর ভক্ত—যাঁরা স্বার্থের জন্য ভক্তি করে।

(৩) ভাড়া–করা ভক্ত—যারা ভক্তের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য পয়সা পায়।

শ্রীমতী ইন্দিরার দলে (২) এবং (৩) নম্বর ভক্তই বেশী বলে মনে হয়। দিল্লীর শোভাযাত্রায় শুনছি এক কোটি টাকা খরচ হয়েছে। বাপরে বাপ!

।। ২২ জুন ১৯৭৫।।

আমরা রকবাজী, দলবাজী, মিছিলবাজী, বমবাজী প্রভৃতি নানা বাজী করে বাজিমাৎ করতে চাই। আজ আমরা শিবাজী উৎসবও করলাম। মহাজাতিসদনে সভা হল। বিচারক শঙ্করপ্রসাদ মিত্র সভাপতি ছিলেন, আমি ছিলাম প্রধান অতিথি। এই জন্য সমস্ত সকালটা লেখার টেবিলে বসতে পারলাম না। বিকেলে পূর্ণিমা সম্মেলন আছে।

কলিকাতা শহরটি অতি মনোলোভা
চারিদিকে আলো গান মিছিল ও সভা
নানাবিধ পরিচ্ছেদ করি দেহ শোভা
ঘুরিয়া বেড়ায় যত ভূতো হবা গবা
ধাক্কা ধাক্কি ধ্বস্তাধস্তি গেল গেল রব
করিতেছে রাজনীতি–সাহিত্য প্রসব
এই রাজনীতি আর এ সাহিত্য শেষ
নিয়ে যাবে আমাদের হায় কোন দেশে
সে দেশের আঁশটে গন্ধ সুগন্ধ নয়
নাসারন্ধ্রে পশে যবে
বমনেচ্ছা হয়।

।। ২৩ জুন ১৯৭৫।।

অনেকদিন পরে আজ রোদ উঠেছে। রোদটা কিন্তু ময়লা ময়লা সূর্য্যদেবের গায়ের উড়ুনিটায় সোনার রং ফোটেনি তেমন। আজ কাগজের খবর সেই মামুলী ইন্দিরা–গান্ধী। বড্ড বেশী থিয়েটারী ঢং। মাঝে মাঝে

প্রহসনও হয়ে যাচ্ছে। ইতিহাসে এ রকম প্রহসন বারবার হয়েছে। ন্যায় ও নীতি বারবার ডিগবাজী খেয়েছে। মহাত্মা গান্ধিজীর আন্দোলেই ভারতের জনগণ নির্ব্বাচিত নেতাকে পদত্যাগ করে পালাতে হয়েছিল। তিনি নিজ বীর্য্যবলে ও তপস্যায় আজ 'নেতাজী' হয়েছেন। জানি না ইন্দিরাজীর সে বীর্য্য ও তপস্যা আছে কিনা।

বিবেকটি যদি থাকে
নির্ম্মল নির্ভয়
হবে জয় হবে জয় হবে জয়
বিশুদ্ধ সুগঠিত চরিত্র দুর্জ্জয়
তূর্য্যকণ্ঠে জেনো চিরকাল কথা কয়।
সেই কথা ইতিহাসে লেখা থাকে স্বর্ণে
সেই কথা কাব্যেতে আঁকা শতবর্ণে
হও তুমি নির্ভয় হও তুমি নির্ম্মল
তাহলেই হবে সব পবিত্র উজ্জ্বল।

।। ২৪ জুন ১৯৭৫।।

আজ সবাই উৎকন্ঠিত হয়ে আছে। সুপ্রীম কোর্ট কি রায় দেন আপিল করবার পর ইন্দিরা আর প্রধান মন্ত্রীর পদে থাকতে পারবেন কিনা—এসব নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। ইন্দিরাজীর পক্ষের কৌঁসুলি ভারতবিখ্যাত পালকীওলা। ইন্দিরা গান্ধী যে দেশের পক্ষে অপরিহার্য্য তা নানা সভায় বিঘোষিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর এই জনপ্রিয়তা কি আইনকে প্রভাবিত করতে পারবে? জানি না।

যতই কেন ঝগড়া করুণ
পাড়ার রাগী বিন্দিরা
আমি কিন্তু খুশী হব
থাকেন যদি ইন্দিরা।

আজও বেশ রোদ উঠেছে। গরমও খুব। এই গরমেও আমার Perfecta গোলাপ গাছটি দুটি ফুল ফুটিয়েছে। ছোট কিন্তু চমৎকার। কাল বিকেলের দিকে চাতকের গলার আওয়াজ পেয়েছিলাম একবার। আজ সে কোথায়? চতুর্দ্দিকে খালি কাক ডাকছে।

কাকেরা শস্তা পাখী চাতকেরা দামী
তাই কি তাহার লাগি উৎসুক আমি?
না, না বন্ধু তাহা নয়—চাই আমি সুর
যে সুর আমারে লয়ে যাবে বহুদূর।

।। ২৫ জুন ১৯৭৫।।

সুপ্রীম কোর্ট ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী পদে থাকবার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ভোট দিতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রীর অন্য সব কাজ করতে পারবেন। তাঁর পক্ষের এবং বিপক্ষের লোকেরা যথারীতি হুড়োহুড়ি করছেন।

ছোঁড়া ছুঁড়ি বুড়োবুড়ি
সকলেই হুড়োহুড়ি–করছে
কাগজেতে হই–চই–হচ্ছে।

শুনলাম 'দেশ' পত্রিকার সনাতন পাঠক নামক কোনও লেখক বঙ্কিমচন্দ্রকে নাকি নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তিনি ভবানী পাঠকের বংশধর নন তো? পূর্বসূরীদের মাথা হেঁট করে দেবার নৈপুণ্য আমাদেরই তো আছে।

ওহে সনাতন ভাই
একটি সত্য আজ শুনে নিন
সূর্য্যকে পেচকরা গাল দেয় প্রত্যহ
সূর্য্য কিন্তু আজও অমলিন।

।। ২৬ জুন ১৯৭৫।।

জয়প্রকাশ নারায়ণ আজ এমন একটি উক্তি করেছেন যাতে তার ভন্ডামি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন—যে প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত অজিতনাথ রায়ের যোগ্যতা বা সততা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই, তবু যেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর আপীল শুনানীতে অংশ গ্রহণ না করেন।

তিনি যদি যোগ্য এবং সৎ বিচারক হন তাহলে অংশ গ্রহন করতে বাধা কি? তিনি বলেছেন অজিতনাথ প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ, কারণ তিনজন জজকে ডিঙিয়ে তাঁকে প্রধান বিচারপতি করা হয়েছে। এরকম নজীর সুপ্রীমকোর্টে নূতন নয়, আগেও করা হয়েছে এরকম। যোগ্যতম লোককেই প্রধান–বিচারপতি করা হয়, বৃদ্ধতম লোককে নয়। ব্যাপারটা যদি বে–আইনী হত তাহলে উপেক্ষিত জজরা ছেড়ে কথা কইতেন না। জয়প্রকাশ নারায়ণের উক্তির মধ্যে ভন্ডামির ভেজাল আছে একটু। তিনি ইন্দিরাজীকে ফ্যাসিস্ট বলছেন, আবার ইন্দিরার দল তাঁকে ফ্যাসিস্ট বলছে।

সরল থাকা শক্ত খুব রাজনীতির মঞ্চে
ধান বলতে অনেকেই বলে ফেলেন ধঞ্চে।

।।২৭ জুন – ১৯৭৫।।

বিরোধীদের বাড়াবাড়ি
প্রধানমন্ত্রী করলেন না সহ্য
ঠিক করলেন ওদের উপর
'মিসা'ই প্রযোজ্য।
তাঁর মতে বিপন্ন যে দেশের নিরাপত্তা
ষড়যন্ত্রকারীদের স্বাধীনতা-হত্যা
করতে হবে সুতরাং –– নাই অন্য পন্থা,
বাক্স খুলে বার করলেন সেই পুরোনো কন্থা
চলতি ভাষায় যার নাম ডান্ডা
তাঁর আশা এতেই সব হয়ে যাবে ঠান্ডা
রেডিওতে প্রধান মন্ত্রী পড়লেন যা মন্ত্র
অর্থ তার জয় জয় জয় গণতন্ত্র।

আজ সকালে এক পশলা বৃষ্টি হয় গেল। সঙ্গে সঙ্গেই রোদ।

এক সঙ্গে পাশাপাশি
ফুটল যেন কান্না-হাসি

গোলাপ ফুটেছে আজ একটি। ভট্টাচার্য্যির শাদা সুগন্ধি গোলাপ।

কাল সন্ধ্যার সময় বাজারে গিয়ে চন্দ্রা একটা ইলিশ মাছ কিনে এনেছিল। রনতু আজ খেয়ে বললে -- একদম তেল নেই। তেল থাকবে কি করে? এখন সব তেল যে দিল্লীতে।

।।২৮ জুন – ১৯৭৫।।

শ্রীযুক্ত নাহার এবং আরও ৪জন কংগ্রেস সদস্যকে সাময়িকভাবে কংগ্রেস দল থেকে পদচ্যুত করা হয়েছে। ইন্দিরাজী কঠোর হস্তে শত্রু দমন করছেন। করছেন কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী। আইনত তাঁকে কেউ ফ্যাসিস্ট্ ডিক্‌টেটার বলবে না। তিনি শক্তিময়ী এবং এইটেই শেষ কথা।

শক্তির মহিমা অপার
ধরে না সে আইনের ধার।

ইন্দিরাজীর এই শক্তি কতটা তা পরবর্তী নির্বাচনে বোঝা যাবে। আপাতত দেখা যাচ্ছে বিরোধীদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে পাঞ্জা কষবার মতো লোক নেই। গুজরাট নির্বাচনে দেখা গেল একক দল হিসাবে ইন্দিরাজীর দলই সব চেয়ে বেশী ভোট পেয়েছেন। ইন্দিরাজী তিনপুরুষ ধরে ভোটের খেলা খেলছেন -- তাঁকে ও খেলায় হারানো শক্ত।

সকাল থেকেই রোদ বর্ষা
কভু মেঘলা কভু ফরসা
বৃষ্টি পড়ছে খামচা খামচা
শুকুচ্ছে না কাপড় গামছা।
চল আমরা ঘাটে যাই
ভিজতে ভিজতে নৌকা বাই।

।।২৯ জুন – ১৯৭৫।।

আজ দমদম সংস্কৃতি-সংসদ আমাকে একটি সম্বর্ধনা দিলেন। সংস্কৃতি-সংসদ প্রবীন পন্ডিতদের সংস্থা। তাঁদের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হয়ে আমি কৃতার্থ হলাম।

সন্ধ্যায় ফিরে শুনলাম রেডিওতে ঘোষিত হয়েছে প্রত্যেক দোকানদারকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ও মজুত-তালিকা টাঙাতে হবে। না টাঙালে গভর্ণমেন্ট কঠোর ব্যবস্থা নেবেন। ব্যবস্থাটা ভালো। কিন্তু আমরা যে ভালো নই। আমরা পুলিশদের ঘুস দেবার চেষ্টা করব।

খ ড়ো দিয়ে কাটবে মোদের?
আছো তুমি কোথা
ঠুকে ঠুকে খঁাড়ার ধার
করে দেব ভেঁাতা!

নিজেরা ভালো না হলে সরকার দেশকে ভালো করতে পারে না, আমরা ইন্দিরা গান্ধীর দোষ ধরতে ব্যস্ত নিজেদের দোষ দেখতে পাই না।

গাছের খাই তলার কুড়োই আমরা সব ওস্তাদ
নিজের পেট ভরাই খালি রাজ্য যাক বরবাদ।

।।৩০ জুন – ১৯৭৫।।

খবরের কাগজগুলো আজকাল বিস্বাদ হয়ে পড়ছে, কারণ তাতে ঘেঁাট নেই। আলানো তরকারীর মত লাগছে। কাগজের মজা ছিল, গজব, কেচ্ছা, পরচর্চা, পরনিন্দা। এখন সেনসর হওয়ার পর থেকে কিছু নেই। যে বাঙালীরা আগে খেলো হুঁকো হাতে চন্ডী-মন্ডপ বিহারী ছিলেন সেই বাঙালীরাই আজকাল চায়ের টেবিলে কাগজ নিয়ে প্রো-ইন্দিরা অ্যান্টি-ইন্দিরার তুফান তুলছেন। তাঁরা বড় বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন।

আজকাল সব খবরই প্রো-ইন্দিরা। এ্যান্টি না থাকলে তর্ক জমে না, রসও জমে না। অনেকেরই তাই মনে হচ্ছে।

ইমার্জেন্সির পঁ্যাচে পড়ে

এ কি হল -- দুস্তর
বাসর ঘরে শালীরা
ভঁাজছে মোহ-মুদগর
নুন নেই কো আচারেতে
নেইকো কোন টকঝাল
জারি করলে ইন্দিরাজী
এ কি আইন দজ্জাল।
তরল প্যারাফিন আমরা
গিলছি সবাই ঢকঢক
পরিণাম এর কি যে হবে
জানি না তো শেষতক্।

।।১ জুলাই – ১৯৭৫।।

আজ জন্মদিন বিধান রায়ের
জন্মদিন তিস্তার
বর্ষা কিন্তু সকাল থেকে
দিচ্ছে নাকো নিস্তার।
মনে হচ্ছে আষাঢ় মাসটি
নয়কো তেমন সৎলোক
পন্ড করে দেবে সবই
এইটে যেন মৎলব।
তবু আমরা থামব না
বর্ষা টর্ষা মানব না।
বিধান রায়ের সভা করব
পায়েস দেব তিস্তাকে
বর্ষা থাকুক গোমড়া মুখে
সে তো দেখছি হিংসুকে।

কেয়া করবী ঊর্ম্মি এসেছিল
খাওয়া শেষ হল দুটো নাগাদ
ইলিশ, রুই, মাংস, পায়েস -- সব ছিল
ভূরি ভোজন শেষে
বৃষ্টি শুরু হল
চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লাম লীলার পাশে।
মহাকালের পটভূমিকায়
এসব তুচ্ছ ঘটনার মূল্য কিছুই নয়
কিন্তু আজকের দিনের
আমার জীবনের ইতিহাসে
এর মূল্য অনেক।

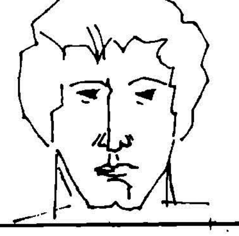

রক্ত ও ভয়ের স্মৃতি ফলক

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

রাস্তায় ছিল উষ্ণ রক্ত। কিন্তু এইসব কিছু প্রণবের মনে একটা মাত্র ছবি এঁকে দিয়েছিল কিছু একটা, কেউ একটা চাপা পড়েছে। এই চাপা পড়া প্রাণীটি কুকুর বিড়াল না মানুষ তা নিয়ে সে ভাবেনি। যেমন ভাবিনি কুকুর বেড়ালের জায়গায় মানুষ হলে তার অনুভূতি একটুও বদলাত কি-না।

ব্রাবোর্ণ রোডের মুখে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। প্রণবের সে সম্পর্কে কিছুই মনে নেই। পরে জানতে পারে বাইকের উপরে বসা মানুষটি ছিল তার জামাইবাবু। একমাত্র দিদির স্বামী। বিয়ে হয়েছিল বছর দেড়েক সবে। এই দুর্ঘটনার করুণ কাহিনীটি প্রণবের পরিবার ও দিদিকে ঘিরে যে কৃষবর্ণ জালটি বোনে সে সবের মধ্যে আমরা প্রবেশ করব না। প্রণবের জামাইবাবুর দুর্ঘটনার মৃত্যু প্রণবকে ধাক্কা দিয়েছে সম্পূর্ণ অন্য একটি ক্ষেত্রে। প্রণব কেঁপে উঠেছে রেদী সমেত।

দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যু, চোখের সামনে কেউ প্রহৃত হচ্ছে, বা প্রচন্ড আঘাতে কুঁকড়ে যাওয়া মানুষ এ পর্যন্ত প্রণবের অনুভূতিকে ছুঁতে পারেনি। ব্রাবোর্ণ রোড দিয়ে ঐ দুর্ঘটনার সময় প্রণব হেঁটে গিয়েছে। ফলে দুর্ঘটনার স্থান কালের কথা জানার পর সে সময়ে তার অনুভূতি কী ছিল তা স্মৃতি আলোড়িত করে উঠে আসে। বাইক চালকের দুটি পা সম্পূর্ণ থেঁৎলে গিয়েছিল। চোট লেগেছিল মাথায়। রাস্তায় ছিল উষ্ণ রক্ত। কিন্তু এইসব কিছু প্রণবের মনে একটি মাত্র ছবি এঁকে দিয়েছিল। কিছু একটা, কেউ একটা চাপা পড়েছে। এই চাপা পড়া প্রাণীটি কুকুর বেড়াল না মানুষ তা নিয়ে সে ভাবেনি। যেমন ভাবেনি কুকুর বেড়ালের জায়গায় মানুষ হলে তার অনুভূতি একটু ও বদলাত কি-না। আসলে সে হল্লা শুনেছিল, রক্তের দাগ দেখে ফেলেছিল। তারপরই রাস্তা বদলে ফেলে।

অঞ্জনের ক্ষেত্রে এই চিত্র সম্পূর্ণ অন্যরকম। আহত, প্রহৃত, বিপন্ন, শোকার্ত মানুষের সঙ্গে অঞ্জন সবসময়ই জড়িয়ে যায়। রাইটার্স থেকে বেরিয়ে সে কখন বাড়ি ফিরবে, বা বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে কখন অফিসে পৌছবে, আদৌ পৌছবে কি-না সে সবই নির্ভর করছে রাস্তায় অঞ্জনের সঙ্গে এ

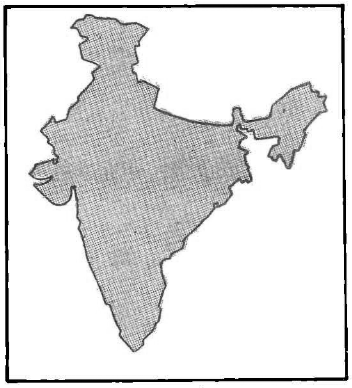

'ভদ্রলোক' শব্দটিতেই সে তার পিতার উল্লেখ করে থাকে। বন্ধুদেরও সময় লেগেছিল এটা বুঝতে। প্রণবের ক্ষেত্রে এতে কোন ভনিতা ছিল না। সে বিশ্বাস করে, অনুভব করে, দেবদুলাল বাবু যে তার পিতা তা ঘটনার আকস্মিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ধরণের মানুষের ভেট হচ্ছে কি-না তার উপর। অত্যন্ত সুস্থ, সাধারণ, স্বাভাবিক মানুষ দেখলে অঞ্জন পালায়। অঞ্জন বাকপটু নয়। লাজুক স্বভাবের এই তরুণ কাউকে আঘাত করতে পারে না। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষরা সবাই এক-একজন খুনী। টালীগঞ্জের বাড়িতে তার এলোমেলো ব্যাচেলার ঘরটি প্রায় সব সময়েই শূণ্য থাকে। অঞ্জন নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে পরিবারের পাঁচজনের সঙ্গে বাস করে না। পড়াশুনোর রেজাল্ট ভালই হচ্ছিল। তবু ইতিহাস নিয়ে বি.এ. পাশ করার পর হঠাৎ একদিন চাকরি শুরু করল।

অঞ্জন একমাস চাকরি করার পর বাড়িতে জানিয়েছিল সে চাকরি করছে। আর সেদিন অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ এই তরুণকে আঘাত করে পরিবারের সবাই। তাঁরা আশাহত। ভেঙে গেছে কল্পনার প্রাসাদ। অঞ্জন এই পরিবারকে পৌছে দেবে অলৌকিক সম্মানের জগতে। এরকম কোন চুক্তি ছিল সে যেন ভয় পেয়ে যায়। অন্যদিকে সে নিজেও ঐ দিনের আগে কখনও এত সাহস, স্বনির্ভরতা দেখায়নি। সম্পূর্ণ নির্বান্ধব অঞ্জন যে হঠাৎ পড়াশুনো ছেড়ে দিতে পারে তা ছিল অকল্পনীয়। আর অঞ্জন যেন ভারমুক্ত হল। দায়হীন হল। এবার সে বেঁচে থাকবে রক্তের সম্পর্ক পেরিয়ে। ভালবাসবে অচেনা, অজানা, সামান্য মানুষকে।

একটি শহর মিতার পা দুটি পঙ্গু করেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেন্ট্রাল পার্কের মধ্যে মিতার কলকাতা গুটিয়ে এসেছে। সব মিলে যা এক বর্গমাইল এলাকা। তবু যাদবপুর কফি হাউসের আড্ডায় সে যায় না। যেমন সে থাকে না য়ুনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের মনোরম পরিবেশে। তার ভালো লাগেনা বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক

রহিত জটিল তত্ত্ব। আর্ট, ফিল্ম, সাহিত্য। তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের 'উড়ুক্কু' ছাত্রছাত্রীর কোন লক্ষণই মিতার মধ্যে প্রকাশিত নয়। মিতাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ধীরেন্দ্রবাবুর কাছে। মিতার বাবার সঙ্গে ভদ্রলোকের রাজনীতি সূত্রে কিছু যোগাযোগ ছিল। নাহলে কোন ছাপোষা মানুষ মনোবিজ্ঞানীর দ্বারস্থ হতে ভয় পান।

মিতার ব্যাধি : অযৌক্তিক ভয়। শহরের ট্রান্সপোর্টে তার ভয়। অজস্র মানুষের শরীর পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে বাসে-ট্রামে যে কিম্ভুত মাংসের পিন্ড তৈরী করে, মিতা ঐ মাংসের পিন্ডটিকে ভয় পায়। দু-একবার গোলপার্ক, গড়িয়াহাট পর্যন্ত সে সাহস করে চলে গিয়ে ছিল। ফেরার সময় সে একের পর এক বাস দেখে গিয়েছে। কিন্তু উঠতে পারেনি। তিন ঘন্টা, চার ঘন্টা, পাঁচ ঘন্টা মিতা বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থেকেছে। শেষপর্যন্ত তাকে ফিরতে হয়েছে ট্যাক্সিতে।

প্রণব, অঞ্জন এবং মিতা এই শহরেরই যুবক-যুবতী। তবু খেলার মাঠের ভিড়, গোদার রেট্রোস্পেকটিভের রাত জাগা লাইনের কেউ নয় প্রণব, অঞ্জন কিংবা মিতা। সল্টলেকের উচ্চবিত্ত পিতার সন্তান প্রণব, মধ্যবিত্ত অঞ্জন এবং ছাপোষা পরিবারের মিতার মধ্যে আচার-আচরণের অনেক পার্থক্য আছে। পার্থক্য আছে তাদের বাংলা উচ্চারণে। এক আঙুলে নাসাপুট চেপে জোড় শ্বাস নেওয়া প্রণবের মুদ্রাদোষ। মিতা রাবীন্দ্রিক বাংলায় কথা বলে, যথেষ্ট সাজান-গোছান মেয়ে সে। অথচ তিনজনকে একটি মালায় গেঁথে ফেলেছে ভয়। 'ভয় আমাদের প্রধান অনুভূতি, আমাদের কোন অ্যাম্বিশন নেই, বলা যেতে পারে বেঁচে আছি এই বাস্তব অতিক্রম করার উপায় নেই, বেঁচে থাকা পেরিয়ে কোন জীবন নেই। জীবনের কল্পনা নেই।'

প্রণবের কথা–

প্রণব বরাবর ভাল ছাত্র। তার ইংরেজী উচ্চারণ সহপাঠী ও সমবয়সীদের মধ্যে জ্বেলে দিত ঈর্ষার অনল। তার মাথাটি ছিল তথ্যে ঠাসা। ছেলেবেলাটা তার কেটেছে প্রদর্শনীর শিশু হিসেবে। যৌথ পরিবার সে দেখেনি। ঠাকুমা পালা করে এসে থাকতেন, কখনও বাবার কাছে কখনও অন্য দুই কাকার কাছে। কাকা-কাকীমারা খুব যে একটা আসত-যেত সেরকম নয়। ছোট্ট পরিবারের ত্রিতল ফ্ল্যাটে একটি সাইকেল নিয়ে প্রণবের প্রথম দশটি বছর কেটে যায়।

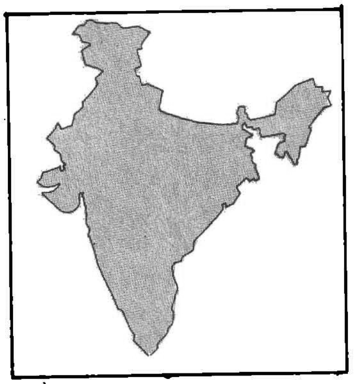

ঘুন ধরে গিয়েছে। ঘুন পোকার
করাতের শব্দ সে শুনতে পায়।
মানুষ তার কাছে যন্ত্র।
চিন্তাহীন, প্রানহীন যন্ত্রের
অবিনশ্বর চিত্র।
অনন্ত বেঁচে থাকা।

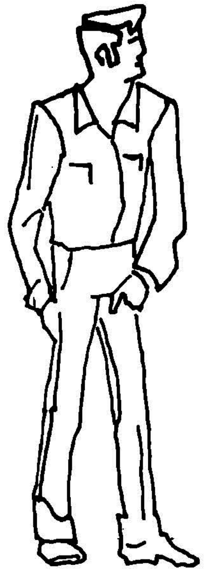

সাইকেলের উপর বসে প্রণব ওটা-সেটা পড়ত। সাইকেল চালিয়ে চলে যেত বইয়ের র‍্যাকের কাছে। প্রণবদের তখনকার ঠিকানা ছিল তালতলার একটি পুরোণ বাড়ি।

কলকাতার এই প্রাচীন পাড়ায় প্রণব পনেরো বছর বয়সেই 'প্রতিভা' শব্দটি উপহার পেতে শুরু করে। পাড়ার সামান্য ছেলেমানুষ থেকে স্কুলের শিক্ষক পর্যন্ত সবাই একযোগে মনে করত প্রণব একদিন অসাধারণ কীর্তি স্থাপন করবে। প্রণব জানত এসবের মূলে যিনি আছেন তিনি ইনকামট্যাক্সের এক অফিসার : দেবদুলাল বাবু। 'ভদ্রলোক' শব্দটিতেই সে তার পিতার উল্লেখ করে থাকে। বন্ধুদের ও সময় লেগেছিল এটা বুঝতে। প্রণবের ক্ষেত্রে এতে কোন ভণিতা ছিল না। সে বিশ্বাস করে, অনুভব করে, দেবদুলাল বাবু যে তার পিতা তা ঘটনার আকস্মিকতা ছাড়া কিছু নয়। ভদ্রলোক ব্যক্তিগত জীবনে বিদ্যা-চর্চা জীবিকা হিসেবে কামনা করেছিলেন। বিদ্যাচর্চা বিষয়ে ভদ্রলোকের দুর্বলতা যে কোন স্বাস্থ্যবান যুবকের নারীর প্রতি আকর্ষণের মতই ছিল তীব্র। ভদ্রলোকের বইয়ের সংগ্রহ শুধু বিশাল নয়, অত্যন্ত নির্বাচিত।

সেদিন বৃষ্টি পড়ছিল। প্রণব মগ্ন ছিল একটি কোমল চিঠি লিখতে। সে জানতনা 'প্রিয়া' শব্দটিতে প্রেমিকাকে সম্বোধন অত্যন্ত সেকেলে ব্যাপার। ভদ্রলোক-ই সেকথা বললেন। প্রণব তখন ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। হঠাৎ সে অনুভব করল তার শরীর-মন একটি মাংসের ডেলা। প্রণব বেশ কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল। নিজের বুদ্ধি সম্পর্কে চিন্তা সম্পর্কে অনাস্থার সূত্রপাত ঘটে ঐ বাদল দিনে।

বাদল দিন ঋতুমালা পেরিয়ে আরেকবার ঘুরে আসার সুযোগ পায়নি। সেই মেয়েটির বাবাকে ভদ্রলোক কিছু বলছিলেন। শুধু তাই নয়, ছ-মাসের মধ্যে প্রণবরা চলে আসে সল্ট লেকের বাড়িতে। একজন সাধারণ অফিসারের পক্ষে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে একটি ফ্ল্যাট কেনার মধ্যে 'দুর্নীতি' নামক একটি শব্দ পোঁতা থাকে, একথা প্রণব জানতে পারে টুয়েলভ ক্লাশে পৌঁছে। প্রণবের লেখা 'প্রিয়া' শব্দটি ততদিনে মলিন হয়ে গিয়েছে। সে নিজেই একথা মেয়েটিকে জানিয়ে ছিল। কিন্তু সত্যিই কি শব্দটিতে মালিন্য জমে ছিল? মাত্র ষোল বছর বয়সে? যে বয়সে যৌন অনুভূতি বলতে সে জানত শুধুই স্পর্শ, কণ্ঠস্বর আর গন্ধ?

প্রণবের ধারণা জন্মায় 'প্রিয়া' শব্দটি কমলা রঙের ফ্রক পরা একটি মেয়ে, সে গলা টিপে মেয়েটিকে মেরেছে। এই ধারণা যখন বদ্ধমূল সেরকম দিনে প্রণব প্রকৃতই একটি খুন করে। একটি বিড়াল ছানার গলায় সে ছুরি বসিয়ে দিল। অত্যন্ত গোপনে, সত্যান্বেষী গোয়েন্দাদের জন্য কোনরকম সূত্র না রেখে, প্রণব সেই খুনের চিহ্ন মুছে ফেলেছিল। আর এই ঘটনাটি সে কখনও প্রকাশ করেনি।

টুয়েলভ ক্লাশে প্রণব অষ্টম স্থান অধিকার করে। তারপর কলেজ জীবনে অনার্স পর্যন্ত রাখতে পারেনি। খালাসিটোলা কলুটোলায় তার যাতায়াত শুরু হয়। অসময়ে নেশা হলে প্রণবের ফুটপাতে থেকে যেতে ইচ্ছে করত। পর মুহূর্তে নিজেকে দেবদাস বলে চিনতে পারে। বোঝে

দেবদাসের মৃত্যু নেই। কেন দেবদাস? ভাবতে ভাবতে প্রণব মুক্ত করে নেয় নিজেকে। দেবদুলাল বাবু এতদিনে বুঝেছেন কী ভয়ংকর ক্ষতি করেছেন। কিন্তু আর কোন সংশোধন নেই। প্রণব মনে করে বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক। 'মিউচুয়াল এক্সচেঞ্জ অব নিউরোসিয়া'।

ঘুন ধরে গিয়েছে। ঘুন পোকার করাতের শব্দ সে শুনতে পায়। মানুষ তার কাছে যন্ত্র। চিন্তাহীন, প্রাণহীন যন্ত্রের অবিনশ্বর চিত্র। অনন্ত বেঁচে থাকা।

প্রিয়া শব্দটি যে মেয়েটির অনুগামী হল প্রণব সেই মেয়ের আর কোন সন্ধান জানে না। তবে তার ধারণা সে মেয়ের কোমরে এতদিনে তিনটি নধর স্তর গড়ে ওঠা বিচিত্র নয়। সেই মেয়ের দুঃখ বিষন্নতার স্মৃতি ও অনুভবে প্রণব সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এমন ও হতে পারে। মানববিদ্বেষী এবং মানবতাবাদীর অন্তর্বর্তী যদি কোন শূণ্যতা থাকে প্রণব সেখানেই অবস্থিত। সে বলতে পারে 'পুলিশ যখন হকার উচ্ছেদ করে, যখন এসপ্ল্যানেডের কলগার্ল মাস্তানের চড় খায়, পকেটমারকে গরম পিচের উপর নগ্ন দেহে শুইয়ে দেওয়া হয় বিশ্বাস করুন আমার কিছু মনে হয় না, আমি কিছু মনে করি না। মানুষের মৃত্যু একটা বেড়ালের মৃত্যুর থেকে আলাদা নয়।

অঞ্জনের কথা—

বাবা জানলা বন্ধ করে দিলেন। মা চিৎকার করে ছিল। বাবা মা-কে ঠেলে দিল শোওয়ার ঘরে। বাইরে গুলির শব্দ। ওরা কেউ অঞ্জনের কথা ভাবেনি।

অঞ্জন তখন বাথরুমে ছিল। ভারী বুটের শব্দ, গুলির শব্দ, বোমার শব্দ ওসবের জন্য তার কান তখন সজাগ। অঞ্জন কেমন গন্ধ পেয়েছিল। বাথরুমে বসে ও টের পাচ্ছিল বাবা-মা কী করছে। মা বলছে 'কী সাংঘাতিক' বাবা বলছে 'তুমি থামবে'? আর বুটের শব্দ।

অঞ্জন একটা বালতি উপুড় করে দেওয়াল ধরে বাথরুমের জানলায় উঠে বসেছিল। জানলা থেকে গলির মোর পর্যন্ত কেষ্টদার চায়ের দোকান পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। কেষ্টদার দোকান খোলা, কিন্তু জটলা নেই। কেষ্টদাকে ও দেখা যাচ্ছে না। একটা ঠেলাওয়ালা গলিতে ঢুকে পড়েছিল। ঠেলাওয়ালার পড়নে একটি খাকি হাফপ্যান্ট। ঠেলাওয়ালার হাত দুটি হঠাৎই উর্ধে উঠল। বুটের শব্দ শোনা গেল।

সংখ্যায় তারা ছিল পাঁচজন। তিনজনের পরনে হাঁটু পর্যন্ত তোলা ধুতি আর হাফ সার্ট। প্যান্ট আর হাওয়াই সার্ট পরনে একজন এসে ঠেলাওয়ালার পেটে এক লাথি মারল। ঠেলাওয়ালা রাস্তায় ছিটকে পড়ে হাত নেড়ে কীসব বলছিল। এমন সময় বুবাইদাকে টানতে-টানতে নিয়ে আসা হল কেষ্টদার দোকানের সামনে। অঞ্জন প্রায় ডাকতে যাচ্ছিল— বু-বাই দা! কিন্তু আওয়াজ হয় নি। হঠাৎ সে দেখল দুপাশের বেশির ভাগ বাড়িরই জানলা দরজা বন্ধ। রবিবার সকাল দশটার পাড়া। রকে কোন যুবক নেই। দোকানে জটলা নেই। পথচারী নেই। বাজারের থলে হাতে মানুষ নেই। ছুটির দিনের সুবেশ অতিথি নেই। সার-সার বন্ধ জানলার বাড়ির মধ্যে দু-একটি ব্যতিক্রম ছিল। দু-চারটি খোলা জানলা পথে কিছু মুখ। বয়স্ক মানুষের মুখ। সে মুখগুলি লক্ষ্য করেছিল।

তাকে বলা হত 'তুই মেয়ে'।
বলা হত শরীরের
পবিত্রতার কথা। সারা গা
ঢেকে কাপড় পড়া
তার অভ্যাস।

একটি মুখ মার বয়সী কোন মহিলার। একজন প্রৌঢ়। একজন যুবক। সে তাদের চোখ দেখতে পাচ্ছিল না। ঐ সব মুখে ভয়ভীতি ছাপিয়ে উঠেছিল কৌতূহল আর অদ্ভুত এক উত্তেজনা। আর হঠাৎ একটি শ্লোগান বুবাইদার পেট ফুটো করে বেরিয়ে আসে। ঐ শ্লোগানের ধুয়াটির জন্য সঞ্চিত বাতাস বুবাইদার পেট ফুটো করে রক্তের সঙ্গে বেরিয়ে এল। জিন্দাবাদ শব্দটি উষ্ণ রক্ত হয়ে গেল। পরপর আরও দুবার গুলি করা হল। অঞ্জন তারপর আর কিছু জানে না। সম্ভবত সে চীৎকার করেছিল, অন্ধকার দেখেছিল।

পরবর্তী পর্যায়-বালতিটি সরে যাওয়ায় অঞ্জন ছিটকে পড়ে। ভয়ে অথবা মাথায় চোট লাগার জন্য যে কারণেই হোক অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আর তার হাত পাঁচিলের ফুলের টবটি উল্টে দিয়েছিল। তিনতলা থেকে ছিটকে পড়া ঐ টবের শব্দ ভারী বুটগুলিকে আকর্ষণ করল। মা এবং বাবা ছুটে এসেছিল অঞ্জনের শুশ্রূষা করতে। দু মিনিটেই অঞ্জন তাকাতে পারে। বাইরে তখন প্রবল বেগে কড়া নাড়া হচ্ছে। তারা অঞ্জনদের বাড়িতে হামলে পড়ল। প্রাথমিক খোঁজ তালাশ শুরু হল ছন্নছাড়া বিদ্রোহীদের। তারপরে খিস্তি। মা আর্তনাদ করছিল। 'আমরা দেখিনি, জানিনা'। 'বিশ্বাস করুন আমরা কিছু দেখিনি-খোকার মৃগী রোগ আছে ও পায়খানা করতে গিয়ে উল্টে পড়েছিল—'। উর্দিপড়া মানুষগুলো অঞ্জনকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। বাবাকে বলল 'একটা সই করে দিন'। বাবা ক্ষীন কণ্ঠে জানতে চাইল 'ওটা কী'? 'বুবাইকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে আপনি সাক্ষী। ফ্যাসফেসে গলা। বাবার কান্ডজ্ঞান ফিরে আসছিল 'না মানে'। 'আপনার ভয় নেই। ও পালাতে চেষ্টা করেছিল এই হবে নিউজ পেপারের স্টোরি'।

বাবা সেদিন সবাইকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল। ফিরে আসে তাড়াতাড়ি। পরের দিন অফিস যায়। তার পরের দিন অফিস যায়। ঘুরে আসে আরেক রবিবার। সেদিন মাংস রান্না হয়েছিল। এর মধ্যে মাকে কয়েকবার বাবা বলেছিল, 'অঞ্জনকে যেন এসব জানান না হয়, ওর নরম মন'। বাবা বলেছিলেন, 'অঞ্জনকে আগলে রেখ'। বাবা ভয় পাচ্ছিল। দেখ অঞ্জন যেন ওসব না বোঝে, দেখ। রক্ত ও ভয়ের স্মৃতি অবশ্য সেদিনই তার ভাগ্য নির্ধারণ করেছিল। অঞ্জন আক্রান্ত হল গভীর বিষন্নতায়।

যোগদিল রাস্তার মিছিলে, নিঃশব্দে।

মিতার কথা

ট্রান্সপোর্ট। যুদ্ধের একটি ছোট্ট দেশলাইয়ের বাক্স। ট্রান্সপোর্ট একটি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। ওখানে যুদ্ধ বন্দীরা থাকে মিতার বয়স তখন তেরো। বয়সের তুলানায় মিতার বাড় বেশী। যৌথ পরিবারে সে বড় হয়েছে। তেরো বছর বয়সের মধ্যে মিতা জেনে গিয়েছিল মেয়েরা গলগ্রহ।

তাকে বলা হত 'তুই মেয়ে'। বলা হত শরীরের পবিত্রতার কথা। সারা গা ঢেকে কাপড় পড়া তার অভ্যাস। তেরো বছর বয়স পর্যন্ত মিতা ফ্রক পড়েছে। তখন তারা থাকত গাঙ্গুলী বাগানে। স্কুল যাদবপুর বিদ্যাপীঠ। ফ্রকের সীমা ছাপান তার শরীর ঐ ভিড়ের বাসে যেদিন পিষ্ট হয় সে রাতে তার ঘুম হয়নি। সে দুঃস্বপ্ন দেখে সুখবোধহীন কিছু পুরুষ শরীর তাকে ধর্ষণ করছে। মিতার ঘুম ভেঙে যায়। এই স্বপ্নটা সে ঘুরে ফিরে দেখত।

মিতা যখন ক্লাশ নাইনের ছাত্রী তখন এক সহপাঠী কিশোর মিতাকে প্রেম নিবেদন করে। মিতা তাকে বলেছিল বাড়িতে আসতে। ছেলেটি বাড়িতে এলে মিতা মাকে ডেকে বলে, 'সুবীর আমাকে ভালবাসে মা, এখন কী হবে'? সুবীর বিদ্যুৎবেগে উঠে-দাঁড়ায়। আর কোনদিন সে মিতার মুখ দেখেনি।

৮০ বি বাসে একদিন এক মাঝবয়সী লোক মিতার পায়ে হাত বুলিয়েছিল। মিতা কেমন অবশ বোধ করতে থাকে। তার ঘুম এসে যাচ্ছিল ঐ মাংস ঠাসা কৌটোর মধ্যে বসে। আকস্মিক সে প্রতিবাদ করে বসে। আর বাসশুদ্ধু লোক তাকে ট্যাক্সি ধরার পরামর্শ দেয়। অশ্লীল মন্তব্য ছুঁড়তে থাকে। এবং এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে, মিতাকে ঠেলে নামিয়ে দেওয়া হয় বাস থেকে। নামার সময় দু-একজন তার তনে আঘাত করে। শরীর ঘিরে সংস্কার সতীত্বের প্রাচীন ব্যাধি ি াকে পেড়ে ফেলল। সে শুধু ধর্ষণে ুঃস্বপ্ন দেখে, ভয় পায়। ভয় ছাড়া তু পার্শ্বে আর কিছু নেই। শূন্যতা ও এক ্যাপক ভয়।□

স্বামী নামক আসামী

মেঘনাদ বর্মা

গৃহবধূ হত্যার বিরুদ্ধে যে সব আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তাতে, বলা বাহুল্য, আমার আঠারো আনা সায় আছে। এযুগেও নারীদের পণ্যের মত ব্যবহার করা হচ্ছে এ এক অতীব লজ্জার কথা। অবশ্যি আমার প্রতিবেশী বন্ধু বিপিন বাবু সেটা মানেন না। বলেন, মেয়েরা আজকাল মোটেই পণ্য নয়। ভেবে দেখুন, পণ বা টাকার বিনিময়ে যাকে কেনা হয় তাকেই পণ্য বলে। মেয়েদের কি আমরা টাকা দিয়ে কিনি? বরং ঠিক তার উল্টো। সে অর্থে ছেলেদেরই পণ্য বলা যায়।

সে যাকগে। অত ব্যাকরণ বুঝিনে। মেয়েদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। মেয়েরা সে সব সইতে না পেরে মরছে। এর একটা ভালো রকমের বিহিত হওয়া উচিত। এই হল মোদ্দা কথা।

কিন্তু এই গৃহবধূ হত্যার বিষয়টি দিন দিন কেমন যেন ঘোরালো হয়ে উঠছে।

প্রথমতঃ বছর দুই আগে অবধি গৃহবধূ হত্যা ছিল কেবল সমাজের ওপর তলার স্ট্যাটাস-সিম্বল। এখন দেখি, রামা-শ্যামা-ভীমার বাড়িতেও গৃহবধূ হত্যার খবর মিলছে।

দ্বিতীয়তঃ আগে কেবল গৃহবধূকে সরাসরি হত্যা করলে বা হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকলেই স্বামী কিংবা তার আত্মীয়স্বজনরা অভিযুক্ত হত। তারপরে গৃহবধূকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা বা বাধ্য করার জন্যও স্বামীপক্ষকে হাজতে যেতে হচ্ছিল। সম্প্রতি দেখছি, নিছক আত্মহত্যা-যাকে আমরা ইনোসেণ্ট সুইসাইড বলি, সে ক্ষেত্রেও স্বামী বেচারাদের টানা-হেঁচড়া চলছে। গৃহবধূর ওপর ক্রমাগত মানসিক চাপ দিয়ে তিলে তিলে তাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেবার অপরাধে স্বামী বেচারা হাজতে।

ক্রমশঃ কোন দিকে এগুচ্ছে ব্যাপারখানা, বিদগ্ধজনেরা (যাঁরা বউকে নিয়ে দিনরাত বিশেষভাবে দগ্ধ হচ্ছেন) বুঝতে পারছেন? পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আজ প্রায় প্রতিটি সংসারে একটা স্নায়ুর লড়াই চলছে। স্বামী পক্ষ উৎকণ্ঠিত এবং বধূটি যারপরনাই পুলকিত। অফিস থেকে ফিরলেই আমার গৃহিনীটি ইদানিং প্রায় রোজই বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে , শুনছো? আজ আবার একটা। বুঝতে গজে আজ আবার খবর বেরিয়েছে, 'গৃহবধূহত্যা' স্বামী হাজতে। বুঝতে কষ্ট হয় না। আমার ওপর আমার প্রিয়তমার এসব হল এক ধরণের সাইকো-থেরাপী। যার সাদামাটা বাংলা হল, বুঝেসুজে চলো মানিক।'

দিন কয়েক আগের কথা। রাত তখন প্রায় এগারোটা। আচমকা আমার সদর দরজায় দুমদাম ধাক্কা। দাদা, দরজা খুলুন। সর্বনাশ হয়ে গেল। সাত-তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখি, পাশের বাড়ির মণিশংকর বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে। তোতলাতে তোতলাতে যা বললো তার অর্থ হল, আজ সন্ধ্যায় খরচ কমানো নিয়ে বউয়ের সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সেই থেকে বউ গুম হয়ে রয়েছে। তার ওপর আবার কুয়ো থেকে দড়িখানা খুলে নিয়ে গিয়ে টাঙিয়ে রেখেছে শোবার ঘরের কোনে। মণিশংকর আমাকে দাদার মতো দেখে। বললাম, চলো তো দেখি। পথে নেবেই দাঁড়িয়ে পড়লো মণিশংকর। ফিসফিসে ভয় জড়ানো গলায় বললো, দাদা, আগাম জামিনটা নিয়ে রাখলে হয় না? যদি ভালো মন্দ কিছু একটা করে ফেলে? ওকে সাহস দিয়ে নিয়ে গেলাম ওর ঘরে। রক্ত শূন্য মুখে ঘরে ঢুকে মণিশংকর দেখলো বউ অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ঠেলা দিতেই ধড়মড় করে উঠে বসল। বাইরে আমাকে দেখে অপ্রস্তুতের একশেষ। বললাম, এসব কি? দড়িটড়ি ঘরে নিয়ে রাখা কেন? মৃদু গলায় মণির বউ জবাব দিল, চুরির ভয়ে দাদা। বারোয়ারী কুয়োতলা তো। রোজই ঘুমোবার আগে তুলে রাখি। শুনে হাসব না কাঁদব বুঝে পাইনে। অত্যাধিক উৎকণ্ঠায় মণিশংকরের আজ এই অবস্থা হয়েছে।

অন্যের ব্যাপার নিয়ে হাসাহাসি করে লাভ কি? আমার নিজের অভিজ্ঞতাটা কি কিছু কম নাকি? ছেলেকে বেশি আদর দেওয়া নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে একটু বচসা। ব্যস, অমনি, মুখ হাঁড়ি করে বউয়ের রান্নাঘরে গমন এবং সেখান থেকে খুন্তি-হাতা, হাঁড়ি-কুড়িতে ঝনাঝন আওয়াজ তুলে আমার হৃৎকম্প জাগানো। এখানেই শেষ নয়। খানিক বাদে দেখি, বউ ডানহাতে কেরোসিনের টিনখানা বাগিয়ে নিয়ে দুপদাপ করে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে। আমি তড়াক করে উঠে দাঁড়াই। সর্বইন্দ্রিয়ে সতর্কতার

ঘণ্টা বেজে যায়। ছুটে গিয়ে সিঁড়ির মুখে ওর পথ আগলে বললাম, একি! কেরোসিনের টিন নিয়ে কোথায় যাচ্ছো? বউ ঠাণ্ডা চোখে আমার দিকে চাইল। তারপর ঠোঁট উলটে বলল, সরো। পথ ছাড়ো। বলেই সিঁড়ি ভেঙে নাবতে লাগলো একতলায়। আমি ওর পিছু পিছু ছুটি। ছুটতে ছুটতে ওর বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে কাগজ গোছের কিছু নজরে পড়লো চকিতে। চিঠি! চিঠি! লিখে রেখে যাচ্ছে। আমার মৃত্যুর জন্য......। কি বিপদ! আরে থামো! এমন কী ঝগড়া হল? ততক্ষণে বউ সদর দরজায় গিয়ে দরজার মুখে বউয়ের পেয়ারের পাড়াতুতো দেওর গিরিধারী। ওর হাতে টিনখানা ধরিয়ে দিয়ে বাঁ হাতের মুঠো খুললো বউ। টাকা আর রেশন কার্ড। গিরিধারীকে ওগুলো দিয়ে বলল, 'একটু জলদি ফিরিস গিরি। ওটা এলে তবে বাচ্চার দুধ গরম হবে। বুঝলি?'

আসুন একটু উল্টো দিকে চোখ ফেরাই।

গেলো পরশু আপিসে গিয়ে দেখলাম পাশের টেবিলের কমলেন্দু বাবুর চোখ মুখ শুকনো। ওঁর ছোট মেয়ে চিঠি লিখেছে, 'ছেলেপিলের অসুখ বিসুখ। নিজেরও শরীর খারাপ। হাজার জ্বালায় জ্বলছি বাবা। ভাবছি কবে এ জীবন যায়।' কমলেন্দু বাবুর মুখে গাঢ় সন্দেহ। একটা বড়সড় ষড়যন্ত্রের হদিস পেয়েছেন যেন। বললেন, 'মেয়ে মরতে চাইছে কেন বলুন তো? থানায় একটা আগাম ডায়েরী করে রাখবো নাকি?

আমাদের অফিসের টাইপিস্ট বিশাখা চন্দননগরে গিয়েছিল দাদার কাছে। আজ ওকে অফিসে দেখে অবাক হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার? দাদার কাছে থাকলে না?'

'ওরে ব্যাস।' বিশাখা দুচোখ কপালে তুলে বললে, 'স্বামী, শাশুড়ী। তারওপর ননদও গিয়ে হাজির। এক্কেবারে ত্রিবেণী সংগম। এ কদিনে বৌদির কিছু একটা ঘটে গেলে ষড়যন্ত্রের অকাট্য প্রমাণ পেয়ে যাবে পুলিশ। চলে এলাম। পরে যাবো। মা ফিরে যাক।'

ব্যাপারটা কোথায় গড়িয়েছে আন্দাজ করা যাচ্ছে? ভয়ে এখন ছেলে, মা এবং বোন এক সঙ্গে থাকতে চাইছে না। থাকলেই সবাই সারাক্ষণ জুজুটি হয়ে থাকে। কখন বৌয়ের মানসিক নির্যাতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোনও কোনও শাশুড়ি নাকি দিনে দশবার বৌমাকে প্রশ্ন করছেন, 'ও বৌমা, তোমার মন ভালো রয়েছে তো বাছা?'

ইদানীং আমি অফিস থেকে ফিরলেই, আমার প্রিয়তমার প্রথম এবং পবিত্র কর্তব্যটি হল চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজটি এগিয়ে দেওয়া। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় পৃষ্ঠার আইন আদালতের কলমটিকে খুলে চোখের সমুখে সাজিয়ে রাখেন তিনি। পাছে আমি পাতা খুলে অন্য কিছু পড়ি, সেই কারণে আগে ভাগেই বলতে থাকেন, 'আজকে অমুকের কেসটার শুনানী হল। পড়ে দ্যাখো।' এধরণের সাইকো-থেরাপীর মধ্যে দিনের পর দিন থেকে স্বামী বেচারাদের যে কী অবস্থা সেটা কেউ ভেবে দেখেছেন? বউকে এবং হাজতকে নিয়ে এত মানসিক চাপ সইতে না পেরে স্বামী বেচারা যদি আত্মহত্যা করেন সে ব্যাপারে আইনের বাঁধুনিটা স্বামীর পক্ষে কতটা শক্তপোক্ত কে জানে? তবে মনে হয় তেমন দিন এলো বলে।

আসলে যাদের আমরা অবলা বলে ব্ল্যাংক সার্টিফিকেট দিয়ে বসে আছি, তাদের একটা বড়সড় অংশ যে লোকচক্ষুর আড়ালে 'খড়্গ হস্তেন সংস্থিতা' এটাই অনেকে বিশ্বাস করেন না। শরৎচন্দ্রের সেই বৈঠকী গল্পটি স্মরণ করুন। পাশের বাড়ি থেকে রোজ শাশুড়ীর গালিগালাজ ভেসে আসে পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে কুৎসিত ভাষায় অথচ মুখচোরা বৌটির কণ্ঠ থেকে কোনওদিন একটা মৃদু জবাবও শোনা যায় না। ক্ষেপে গিয়ে একদিন পড়শীরা চলল বুড়ীকে ধমকাতে। বুড়ীর বাড়িতে ঢোকার আগেই দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে যা দেখল তাতে ওদের চক্ষুচড়ক গাছ! বুড়ী দাওয়ায় বসে বউকে সমানে গালিগালাজ দিয়ে চলেছে। আর বৌটি মুখে রা'টি না ফুটিয়ে সারা উঠোনময় নিঃশব্দে অঙ্গভঙ্গি করে নাচছে। শাশুড়ীকে ভেঙাচ্ছে, বক দেখাচ্ছে।

সে যা হোক, বধূহত্যা (কিংবা আত্মহত্যা) নিয়ে যত প্রচার চলছে, ততই তা থেকে মওকা লুটছে দু'শ্রেণীর মানুষ। প্রথম শ্রেণী হল উকিলরা। তারা এখন তরুণী বধূর মৃত্যু সংবাদ শুনলেই কাগজের লোকের আগে গিয়ে হাজির হচ্ছে মৃতার বাপের বাড়িতে। দ্বিতীয় শ্রেণী হল জ্যোতিষীরা। আমাদের পাড়ার ক্ষুদিরাম চক্রবর্তী, জ্যোতিষার্ণবের 'গ্রহ গবেষণা কেন্দ্রে' গত দশ বছর খদ্দের জুটতো না। সারা দিন একলাটি বসে মাছি তাড়াতেন চক্রবর্তী মশাই। ইদানীং তাঁর গ্রহ গবেষণা কেন্দ্রের সামনে ঢাউশ সাইনবোর্ড সাবধান! সাবধান!! আগে হইতে সতর্ক হউন। বিবাহ করিবার পূর্বে পাত্রীর আত্মহত্যা কিংবা অপঘাতে মৃত্যু যোগ রহিয়াছে কিনা যাচাই করিয়া তবেই শুভ কার্যে অগ্রসর হউন। পাত্রীর কোষ্ঠীসহ আজই যোগাযোগ করুন।

বলাবাহুল্য চক্কোত্তি মশাইয়ের গ্রহ গবেষণা কেন্দ্রে এখন ভীড় ঠেলা দায়। চরম নাস্তিক পাত্রও পাত্রীর কোষ্ঠীখানা দেখিয়ে নিচ্ছে। চক্কোত্তি মশাইয়ের রাতারাতি আঙুল ফুলে কলা গাছ। □

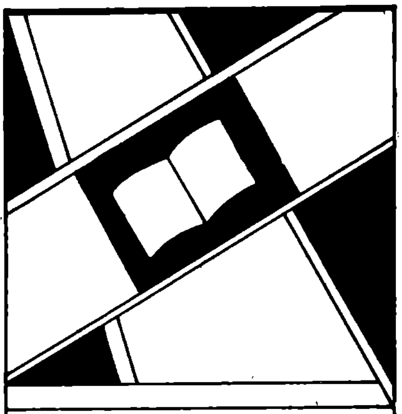

- **তে হি নো দিবসা ঃ**
  ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। শিক্ষা ও সমাজ সম্পর্কে সাহসী সমালোচনা। [৪০.০০]
- **সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ**
  একখণ্ডে সমগ্র কাব্যাংশ (১৪ কাব্য-গ্রন্থ) ডঃ অলোক রায় সম্পাদিত। [১০০.০০]
- **বৈষ্ণব পদাবলী**
  হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত চার হাজার পদের আকর-গ্রন্থ [৭৫.০০]
- **ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য**
  ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। সাহিত্য একাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত। [৩০.০০]
- **উপনিষদের দর্শন**
  হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায় [২০.০০]
- **SWAMI VIVEKANANDA AND INDIAN NATIONALISM**
  ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত [৪৫.০০]
- **INDIA WRESTS FREEDOM**
  ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত [৭০.০০]
- **BUDDHIST MONUMENTS**
  ডঃ দেবলা মিত্র। বহু ছবি [২০০.০০]

সা হি ত্য সং স দ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড।
কলিকাতা ৯

ধারাবাহিক

নূপুরের মতো

অনুলিখন ঃ অনুপমা দাশ

চৌদ্দ

পাবলোভার বাড়িতে চায়ের আসরে সেদিন উপস্থিত ছিলেন – বাবা, আমাদের মহারাজা, স্যার উইলিয়াম রদেনস্টাইন, মিঃ দানদ্রেঁ ও মাদাম পাবলোভা। আমিও ছিলাম সেখানে। আমার বিষয়ই আলোচনার জন্য তাঁরা মিলিত হয়েছেন।

স্যার রদেনস্টাইন বলছেন মাদাম পাবলোভাকে যে, আপনি জানেন মাদাম, উদয়কে রোমে পাঠাবার সব ব্যবস্থাই প্রায় হয়ে এসেছে। তাছাড়া ওর জীবনটাই যেন ছবি আঁকার জন্য। ওর কাজ দেখলে আপনি তা বুঝতে পারবেন। আমি তো ওকে দু'বছর ধরে দেখছি, – হি ইজ মেড ফর পেনটিং।

পাবলোভা চুপ করে শুনলেন সব। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, 'আমি শঙ্করকে আপনার মত অতদিন ধরে জানিনা ঠিকই, কিন্তু এই কয়েকদিনের ভেতর ওর যেটুকু পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে আমি বলতে পারি হি ইজ মেড ফর ডানসিং অলসো।

তখন তাঁরা দেখতে চেষ্টা করলেন যে, একটা শেষ করে অন্যটা করা সম্ভব কিনা। কিন্তু সময়ের হিসাবে দুটোকেই প্রায় একসঙ্গে করে যাচ্ছে। অতএব কি করা যায়?

তখন মহারাজা বললেন, 'আমরা নিজেদের মধ্যে তর্ক করে, আলোচনা করে সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করছি। কিন্তু যার জন্য এসব, সেতো সামনেই বসে আছে, ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক, ও কি চায়? তাহলেই তো সব সমস্যা মিটে যাবে। বাবা শুনে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে উদয়, তোর কি ইচ্ছে বল?

বলা বাহুল্য, কথাবার্তা এসব এতক্ষণ ইংরাজিতেই হচ্ছিল। বাবা আবার বললেন, 'এবার বাংলায়, মন খুলে বলে ফেল তুই কি চাস?'

আমি মাথা নিচু করে বসেছিলাম। বাবার প্রশ্ন শুনে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আই ওয়ান্ট টু টেক আপ ডানসিং'।

জানিনা আমার এই উত্তর শুনে কার মনে কি হয়েছিল। তবে স্যার উইলিয়াম রদেনস্টাইন যে ব্যথা পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। তিনি কি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, বিরক্ত হয়েছিলেন? নাকি আমার বয়স এবং সে বয়সে নতুন একটা জীবনের প্রতি যে স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ ও আমার ফিলিং – এসব বিবেচনা করে আমায় ক্ষমা করেছিলেন?

তারপর স্যার সকলকে বিদায় জানিয়ে ধীরে-ধীরে চলে গেলেন।

আমিও সেদিন বুঝতে পারিনি যে, আমার সেই সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না ভুল ছিল। অঙ্কনের ক্ষেত্র থেকে নাচের ক্ষেত্রে গিয়ে পড়লে আমি লাভবান হবো কিনা – সে প্রশ্নও মনে জাগেনি। তবে আজ এই উনিশশ' তিয়াত্তরে বেশ বুঝতে পারি শিল্পের ক্ষেত্রে লাভ-লোকসানের কোন কথাই আসে না। এর এক একটি ধারা একে অন্যের পরিপূরক। আসল কথা হলো মনের ভেতরের ভাব বা রিয়ালিজেশন। বোম্বাই-এর জে. জে. স্কুল অব আর্ট বা রয়্যাল কলেজ অব আর্টের যে শিক্ষা, কিংবা রদেনস্টাইনের ভাষায় আমার ভেতরের জন্মগত যে আঁকার ঝোঁক সে-সব না থাকলে নাচের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে আমার যে সফলতা তা সম্ভব হতো কিনা জানি না। পেইন্টিং শিখতে গেলে আর্কিটেকচার, অ্যানাটমি ইত্যাদি বিষয়ও শিখতে হয় এবং সে শিক্ষাটুকু যে নাচের সময় আমায় বিশেষভাবেই সাহায্য করেছে তা তো অস্বীকার করা যায় না। স্যার রদেনস্টাইনের শিক্ষা থেকে যে সূক্ষ্মবোধটা আমার মধ্যে গড়ে উঠেছিল তার পুরোপুরি সহায়তা নিয়ে তার সদ্ব্যবহার আমি করেছি আমার নাচের মধ্যে। তাই আমি আমার নামের জন্য, খ্যাতির জন্য সমানভাবে ঋণী মাদাম পাবলোভা ও স্যার রদেনস্টাইনের কাছে। কিন্তু যখন ভাবি সেই বেনারসে ধুতি পরে, আর তারই একপ্রান্ত গায়ে জড়িয়ে ঘুরে বেড়াত যে গুন্ডা খোকাটি, তার জীবনে প্রথমে অম্বিকাচরণের প্রভাব, তারপর স্যার রদেনস্টাইনের স্নেহ ও মাদাম পাবলোভার সহায়তার কথা এবং সেই ছেলেটির জীবনে সফলতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবার কথা বা তার কাজের কথা, তখন আমার চিন্তা যেন হারিয়ে ফেলে তার পথ, – আই জাসট ফিল লস্ট। কেমন করে সে-সব সম্ভব হলো, তা জিজ্ঞেস করলে আমি জবাব দিতে পারবো না। তবে সেই জবাব না দিতে পারার মধ্যেই যে আমি পেয়েছি, প্রত্যক্ষভাবে পেয়েছি সর্বশক্তিমান ভগবানকে, তা আমি জোর গলায় বলতে পারি।

সেই উনিশশ' বাইশ সাল। সেদিন 'আইভি-হাউস' থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলেন স্যার উইলিয়াম রদেনস্টাইন। আর আমি প্রবেশ করলাম নাচের জগতে। এ ঘটনার বহু পরে উনিশশ' চৌত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ সালে লন্ডনে শো দিতে গিয়ে স্যার উইলিয়াম রদেনস্টাইনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম আমার শো-এ। শো-এর পর হাসিমুখে সেই স্নেহময় শিক্ষকরূপে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'ওয়েল উদয়, দিস হ্যাড টু বি ডান। ইউ হ্যাভ ডান গুড আউট অব ইট। আই কনগ্রাচুলেট ইউ। আই অ্যাম প্রাউড অব ইউ। তারপর অনেক কথার পর স্যার বললেন, 'ওয়েল ওল্ড ম্যান, তোমাকে একটা অনুরোধ করবো। উইল ইউ পোস ফর মি?

তাঁর এ-প্রস্তাব আমার কাছে পরম ভাগ্য বলে মনে হলো। তখনই দিন ঠিক হয়ে গেল। নির্দিষ্ট দিনে গেলাম তাঁর কাছে। উঃ, কতদিন পরে সেই রয়্যাল কলেজ অব আর্টসে গেলাম, সেই ক্লাসরুম, সেই উইলিয়ামের ঘর। একদিন এখানে আসতাম ছাত্র হিসাবে, আর সেদিন গেলাম তাঁর জন্য। কেননা তিনি আমার ছবি আঁকতে চান। কি সৌভাগ্য আমার!

আমার সঙ্গে ছিলেন বন্ধু বীরেন মুখার্জি। বীরেন ক্যামেরা দিয়ে চিরকালের জন্য ধরে রাখলো সেই পবিত্র সুন্দর মুহূর্তগুলিকে। সে ফটোগুলি আমার কাছে এক অমূল্য সম্পদ।

যাই হোক, মাদাম পাবলোভার আইভি-হাউসে সেদিনের সেই মিটিং শেষ হলো, আর আমিও মনের ভারমুক্ত হয়ে যোগ দিলাম পাবলোভার দলে।

শো হবে পিকাডিলির কাছেই কভেন্ট গার্ডেনে। কভেন্ট গার্ডেনের রয়্যাল অপেরা হাউসে শো দেওয়া সহজ কথা নয়। দর্শকদের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত শিল্পী না হলে ওখানে প্রবেশের অধিকার সকল নৃত্যশিল্পীর বা তাঁর দলের হয় না। পাবলোভার মত সর্বসাধারণের শ্রদ্ধেয়া শিল্পীর জন্য অবশ্য কভেন্ট গার্ডেনের দ্বার সর্বদাই খোলা।

রিহার্সাল, - - এদের রিহার্সাল দেখে আমি অবাক। কী নিষ্ঠা দিয়ে, কী মন প্রাণ দিয়ে তারা কাজ করে, চোখে না দেখলে কল্পনা করা যায় না। ডিসিপ্লিনের প্রতিমূর্তি যেন এই পাবলোভার গোটা দলটি। ছেলেমেয়েগুলির কি আর নিজস্ব সুখ, দুঃখ ব্যথা, অভিমান - -

এ সব ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। কাজের সময়ের বাইরে নিশ্চয়ই ছিল সে-বৃত্তিগুলির প্রকাশ। কিন্তু কাজের সময় কি শো-এর সময় তারা সে-সব তুচ্ছ ঘাত-প্রতিঘাতের উর্দ্ধে। তখন তাদের সামনে থেকে সব কিছু যেন উবে যেতো। শুধু জেগে থাকতো পাবলিক, আর কাজ। কাজ তাদের কাছে ভগবান। পাবলিক-এর সামনে এপিয়ার হওয়া তাদের মন খুশি করবার জন্য, তাদের আনন্দ দেবার জন্য, - - একথা আর্টিস্টদের সর্বদা মনে রাখা উচিত। দর্শকরা আমাদের থেকে প্রত্যাশা করেন ঐ আনন্দটুকুই, আমাদের ঘরোয়া মামলার বিবরণ নয়। আর শো-এর মধ্য দিয়ে নিজের নিজের কাজের মাধ্যমে প্রতিটি আর্টিস্ট যে দর্শক সাধারণকে সেবা করার সুযোগটুকু পান, তার মত পবিত্র আর কি হতে পারে?

পাবলোভার দলে বছর খানেক কাজ করার সুযোগ অনেক বিষয়ে আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। তাঁর দলের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন তিনি, তিনি নিজে যে দৃষ্টান্ত রাখতেন দলের সামনে, তা যাদুমন্ত্রের মত কাজ করতো। পাবলোভাকে সর্বদা দেখতাম শো-এর ঘন্টা দুয়েক আগে থিয়েটারে চলে যেতেন। ব্যাক স্টেজে একের পর এক প্র্যাকটিস করছেন তাঁর করণীয় জিনিস। কেউ কোথাও নেই, শুধু এঁরা তাদের কাজ করছে। রিলিজিয়ানের মত রোজ তাঁর এই কাজ।

তাঁর দলে থাকার সময়ই সময়ের গুরুত্ব কতটা তা বুঝতে পারলাম। এক একটি আইটেম তার গুণাগুণ অনুযায়ী কতক্ষণ পরিবেশিত হওয়া উচিত, সে-সব বিষয়েও আমার অনেক শিখবার ছিল তাঁর কাছে।

সব দিকেই নজর পাবলোভার। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষমা ছিল না তাঁর কাছে। তাই আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে রুক্ষ মেজাজি বলেই মনে হতো। সকলেই তটস্থ থাকতো - মাদাম কখন কাকে কি বলেন। তবে কি জানি কেন আমার সঙ্গে কখনও হাসিমুখে ছাড়া কথা বলেননি তিনি। আমার এ ধরণের সৌভাগ্যের আর একটি নিদর্শন হলেন বাবা - ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। পরবর্তীকালে বাবা কখনও আমার উপর রাগ করেননি। অথচ সবাই তাঁকে ভয় করে রুক্ষ মেজাজের জন্য।

যাই হোক, পাবলোভাকে 'রাধাকৃষ্ণ' নাচের মর্ম বোঝাবার জন্য 'গীতগোবিন্দ'র ইংরাজি অনুবাদ কেনা হয়েছিল। ভাবটা পরিষ্কার করে বোঝাবার পর নাচের পালা। পাবলোভাকে হাতের মুভমেন্ট দেখিয়ে দিতাম। উনি তা দেখতেন এবং করবার চেষ্টা করতেন। পরিষ্কার মনে আছে, ঠিক মত করতে না পেরে নিজেকে ধিক্কার দিতেন। মাদাম নিজের হাতে কামড় দিতেন, কাঁদতে কাঁদতে বলতেন, 'লোকে বলে আমি ব্যালে সম্রাজ্ঞী, অথচ রাধার ঐ নমনীয় হাতের ভঙ্গিটুকুও আমি করতে পারছি না। তুমি পুরুষ হয়ে যে ভাবে করছো তা অপূর্ব। তার এক কণাও আমি একজন নারী হয়েও করতে পারছি না। হাতের কোন কাজই যে নেই আমাদের ব্যালেতে, - - হাত আড়ষ্ট হয়ে গেছে।'

দাদা বললেন, "ভেবে দেখ অনুপমা, তাঁর মত শিল্পীর মুখে এই কথা! তাঁর এই আচরণ তাঁর চরিত্রকে আরো বড় করে তুলেছিল সকলের চোখে সন্দেহ নেই।

আর একবার ডাইং সোয়ানের প্রসঙ্গে কি কথায় হাঁসের মত ডানা মেলে ওড়ার ভঙ্গির কথা উঠলো। পাবলোভা দেখালেন ভঙ্গিটি, - - তাঁর দু'হাত দুদিকে টান না করে যদি কাঁধ, কনুই, কব্জি এসব জায়গাগুলি পর পর ভেঙ্গে কাজে লাগানো যায়, তাহলে ওড়ার ভঙ্গিটি আরও স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়ে উঠবে। পাবলোভাকে একথা বলতেই উনি উৎসাহিত হয়ে আমায় দেখাতে বললেন। আমি করলাম। মনে আছে, সেদিন পাবলোভা এবং উপস্থিত সকলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমার বাইশ বছরের তরুণ মনে একটা আত্মপ্রত্যয় এনে দিয়েছিল। এবং তারপর থেকে তাঁকে নিয়মিত ভাবে আমার দেখান মুভমেন্টগুলি সাধনা করতে দেখেছি।

নাচের রিহার্সালের সঙ্গে সঙ্গে কসটিউম ও মিউজিকও তৈরি হয়ে চলেছে। বিখ্যাত বারনেটের দোকান থেকে তৈরি হতো এদের পোষাক। এক্ষেত্রেও কেমন করে ঘাঘরা কিংবা পায়জামা তৈরি করতে হয় তাও দেখিয়ে দিয়েছি দর্জিকে। ভারতীয় সেই বর্ণবৈচিত্রময় পোষাকে ছেলেমেয়েদের দেখাতো বড় সুন্দর। ধীরে ধীরে শো-এর দিন এগিয়ে আসছে। প্রোগ্রামে আমার নাম নিয়ে বড় মজা হয়েছিল। ম্যানেজার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমার ভারতীয় নামই থাকবে, নাকি কফ্ কিংবা উস্কিটুস্কি লাগিয়ে নামটাতে একটু রুশ গন্ধ এনে দেবে? তাঁর এ কথা শুনে বেশ মজা লাগলো, - - কিন্তু আমার ভারতীয় নামই বজায় রাখলাম - - উদয়শংকর চৌধুরী।

পাবলোভার দলে যে শুধু রুশ ছেলেমেয়েই ছিল তা নয়। দু'চারজন অন্য দেশেরও ছিল। তবে আমার নামটা বোধ হয় ওদের সকলের চাইতে বেশি রকমের আলাদা বলেই হয়তো ম্যানেজারটি অমনি বলেছিল।

যতই শো এগিয়ে আসছে, ততই মনের ভেতর একটা উত্তেজনা, একটা আনন্দ, একটা গর্ববোধ অনুভব করছিলাম। পাবলোভার সঙ্গে অবতীর্ণ হবো মঞ্চে এবং আমারই তৈরি ব্যালেতে, এযেন আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু শোয়ের সময় সবকিছুই সুন্দরভাবে হয়ে গেল।

প্রথমে কয়েকটি ওদের ব্যালে প্রদর্শিত হলো। তারপর হিন্দুবিবাহ।

বিবাহের সব আয়োজনই করা হয়েছিল, হোমাগ্নির সামনে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ, শঙ্খধ্বনি, পুজোর থালা-বাসন এবং কনের সাতপাক দেওয়া বরকে ঘিরে, - - এসবের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শেষে বর-বধূকে ঘিরে নাচ। ঝকমকে সাজপোশাকে উজ্জ্বল আলোর মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হলো হিন্দুবিবাহ।

তারপর স্নিগ্ধ নীল আলোয় ষোলজন সখীর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ নাচ, - - সময় মাত্র দশ মিনিট। মনে পড়ে, শো শেষ হলো, করতালি ও শুভেচ্ছার ভারে আমার মন অবশ হয়ে আসছিল। একটা স্ট্রান্স-এর মত কেটে গেল সময়টা।"

সেদিনের সেই শো পেশাদারি মঞ্চে দাদার জীবনের প্রথম শো। আর সেই শো-এর এ রকম সাফল্য - - এ যেন হবার ছিল, তা না হলে দাদা পরবর্তী জীবনে 'উদয়শংকর' এই নামে বিখ্যাত হয়ে উঠতেন কিনা সন্দেহ। সেদিন সেই বাইশ বছরের এক তরুণের জীবনে এ-ঘটনাটা ভবিষ্যত পথ চলার এক বড় রকমের মূলধন হয়ে রইলো যে তা বলাই বাহুল্য। অঙ্কনক্ষেত্র থেকে নিজেকে নৃত্যমন্দিরে নিবেদন-এর পরও যদি এতটুকুও পিছুটান থাকতো দাদার মনে, সেদিনের সে-সাফল্য, সেই চিহ্নটুকু মুছে দিয়েছিল সন্দেহ নাই। তাই বলতে গেলে

জীবনের উজ্জ্বল মুহূর্তগুলির মধ্যে সেদিনটি হলো অন্যতম।

প্রথম থেকেই আনা পাবলোভা দাদার অকৃত্রিম শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্টগুলি তাঁকে আলাদা একটা মর্যাদা দিয়েছিল। কিন্ত তাহলেও তিনি মানুষ, -- দোষগুণের প্রকৃত মানুষ। তাই তাঁর একদিনের ব্যবহার দাদার মনে যে আঘাত হেনেছিল, তার কথা বলতে গিয়েই দাদা বললেন, "দলের মধ্যে দুটি ইটালিয়ান বোন ছিল। নাম শকি ও অ্যাডালেট। শকিকে দেখতে অনেকটা পাবলোভার মত, আর নাচতোও বড় সুন্দর। একবার এক ব্যালেতে পাবলোভা যদিও প্রধান, তবু থিম অনুযায়ী তাঁর প্রবেশ পরে। প্রথমে যায় ছটি মেয়ে, আর তাদের পুরোভাগে যায় শকি। একদিন দর্শকরা ভুল করে শকিকেই ভাবলো পাবলোভা। আর তাই সে মঞ্চে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচন্ড করতালি দিয়ে তাঁকে জানালো স্বাগত। কিছু পরে সত্যিকার পাবলোভা ঢুকতেই পাবলিক ভুল বুঝতে পেরে দ্বিগুণ জোরে হাততালি দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো।

কিন্তু পরদিন দেখলাম -- ঐ ব্যালেটিতে শকির জায়গায় ঢুকলো অন্য একটি মেয়ে এবং শকি ঢুকলো একদম শেষে। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, -- পাবলোভা চান না যে পুরোভাগে শকি এসে আবার দর্শকদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করুক। তা দেখে আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। পাবলোভা এটা করলেন ঈর্ষার বশে। কিন্ত কেন? তাঁর মত শিল্পীর কি এটা শোভা পায়? তিনি নিশ্চয়ই ভালভাবে জানেন যে, তাঁর সঙ্গে নাচের ক্ষেত্রে শকির কোন তুলনাই চলে না, -- পাবলোভা শুধু পাবলোভাই! তবু আকৃতিগত সাদৃশ্যের জন্য যদি একটু সাধুবাদ বা করতালি শকির ভাগ্যে জোটে, তাতে ওঁর মনে কেন এই দাহ সৃষ্টি হবে?

ঈর্ষার এই দাহ ধীরে ধীরে মারাত্মক আকার নিতে পারে, যাতে কিনা ট্রুপের স্বার্থ বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা থাকে। ট্রুপ তো সবাইকে নিয়ে, সকলের আন্তরিক পরিশ্রমেই এর সাফল্য। আর শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন বিরাট, উদার, তেমনি বড় ও প্রসারিত হওয়া উচিত শিল্পীর মন। যাই হোক আমার মনটা ঐ দুই ইটালিয়ান বোনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়লো। আর এই সহানুভূতির সূত্র ধরেই আমাদের মধ্যে একটা স্বচ্ছ সরল বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

কথায়-কথায় ওরা একদিন বললে যে, ভবিষ্যতে ভারতীয় নাচের একটা দল করা হয়তো সম্ভব হবে আমার পক্ষে। আর সে-দল হবে হিংসা বা কোনরূপ হীনমন্যতার উর্দ্ধে। আর তাহলে তারা দু'জনে আনন্দে কাজ করতে পারবে সেই দলে। নিতান্ত খেলার ছলে বললেও ওদের এই কথা আমার মনে এক উচ্চাকাঙ্খার বীজ বপন করেছিল। যদিও তখন জানতাম, সে আশাটি এক দুঃসাহস, তবু সে-চিন্তাটাকে মনের মধ্যে পোষণ করে চললাম।

বছরের শেষ মাস ডিসেম্বর। পাবলোভা যে আমাকে স্নেহ করেন, তা জানতাম। কিন্তু যখন আট ডিসেম্বর আমার জন্মদিনে তিনি আমাকে এক সোনার ঘড়ি উপহার দিলেন, তখন অনুভব করলাম তাঁর স্নেহের পরিমাণ কতো! মাদাম পাবলোভার চরিত্রের এ আবার আর এক দিক। বড়দিনের সময় সবাইকে তিনি কোন না কোন জিনিস উপহার দেবেন।

যাক, এদিকে কভেন্ট গার্ডেনের শো প্রায় শেষ হয়ে আসছে। এর পর পাবলোভা যাবেন আমাকে সঙ্গে করে সফরে। লন্ডনের এই কন্ট্রাকটটা শেষ হলেই ডিসেম্বরের শেষে তাঁরা যাবেন আমেরিকা। এ ধরণের কন্ট্রাকট অনেক আগে থেকেই ঠিক হয়ে থাকে। পাবলোভার কাছে জেনেছিলাম যে, আমেরিকা সফরে ওরিয়েন্টাল ইম্প্রেশনের রাধাকৃষ্ণ বা হিন্দুবিবাহ এ-দুটি নাচ নিয়ে যাবার কোন পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। কিন্তু লন্ডনে ওদুটি নাচের জনপ্রিয়তা দেখে তাঁর মত বিচক্ষণ শিল্পী বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমেরিকাতেও সাড়া জাগাবে ঐ দুটি ব্যালে।

তাই যখন পাবলোভা আমাকে জানালেন যে, তিনি চান আমি তাঁর সঙ্গে আমেরিকা যাই, তখন আমার প্রায় আনন্দে আত্মহারা হবার অবস্থা। তখনই আমাদের মধ্যে ঠিক হয়ে গেল যে ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে আমরা যাত্রা করবো আমেরিকা।

আমেরিকা যাবার পর আমি সপ্তাহে সপ্তাহে দু'শ' ডলার করে পেতাম। সে-সময় নিজেকে মনে হতো -- বেশ কিছু বড় একটা। রাধাকৃষ্ণ ও হিন্দু-বিবাহ, ব্যালে দুটির পরিকল্পনা বাবদ রয়্যালটিও পেয়েছিলাম বেশ কিছু অর্থ। তার পরিমাণ এখন আর মনে নেই। শুধু নিজেকে বেশ উপার্জনক্ষম যুবক বলেই মনে হতো এবং সেটাই ছিল বড় কথা। কিন্ত অর্থ উপার্জন করতে পারলেই যে শুধু দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না, -- তাকে রক্ষা করাটাও যে একটা দায়িত্ব, তা বোঝার মত বয়স তখন ছিল না।

মনে আছে, সে-সময় লন্ডনের চেল্‌সিতে নদীর ধারে আমি ও ভেরা একটি বাড়ি ভাড়া করেছিলাম। বাসনপত্রও কেনা হয়েছিল। ভেরার খুব শখ ছিল নানা রকমের পোশাক-পরিচ্ছদের, -- নতুন নতুন ডিজাইনের পোশাক পরতে ও খুব ভালবাসতো। তার জন্য একটা সেলাইয়ের কলও কেনা হয়েছিল সে বাড়িতে। বিয়ে করে এই নতুন বাড়িতে উঠে আসবো আমরা, এমনই ঠিক ছিল। কিন্ত পাবলোভার ট্রুপে যোগ দেওয়া, আমেরিকায় যাওয়া, এসব কারণে একটা মিউচুয়াল ডিলে আমরা মেনে নিয়েছিলাম। তাই এ বাড়িটা ভাড়া নিলেও আমি তখনও থাকতাম শেফার্ডস বুশের বাড়িতে। আর ভেরা থাকতো ওর নিজের বাড়িতে। এদিকে উপার্জন করি, তায় আবার পুরুষ মানুষ। কাজেই নতুন বাড়ির যাবতীয় খরচ বহন করা এবং ওর নিত্যনতুন পোশাক কেনার ঝোঁক মেটান সবই আমি করতাম একটা অহঙ্কারের বশে।

বলতে ভুল হলো, ভেরাও আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল পাবলোভার ট্রুপে। অজন্তা ব্যালের তিন মিনিটের নাচে ও ছিল আমার পার্টনার এবং ওকেও পাবলোভা নিয়ে গিয়েছিলেন আমেরিকায় আমার অনুরোধে।

ভেরার এই পোশাক কেনা নিয়ে একদিন এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। সেটা ছিল নিউইয়র্ক-এর ঘটনা। তখন সবচেয়ে হালফ্যাশন হলো টাইট স্কার্ট পরা, যা পরে কিনা তাড়াতাড়ি মোটে হাঁটা যায় না। সে সময় আমাদের শো চলছে রয়্যাল অপেরা হাউসে। আমরা দু'জনে ট্যাক্সি করে যাচ্ছি থিয়েটারে। ভেরার পরণে অমনি এক টাইট স্কার্ট। মনের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই একটা ব্যস্ততা রয়েছে। থিয়েটারে নেমে যখন ভাড়া মেটাতে আমি ব্যস্ত, সে সময় নামতে গিয়ে ভেরা রাস্তায় পড়ে যায়। ওকে হাত ধরে নামানোর কথা অন্যমনস্ক থাকায় একদম ভুলে গিয়েছিলাম। তায় আবার অমনি স্কার্ট পরেছে। ভেরা রাগ করে উঠে

দাঁড়িয়েই ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিয়েছে আমার গালে। সঙ্গে-সঙ্গে আমিও এক চড় দিলাম ওর গালে। ড্রাইভারটি পুরো ঘটনাটি দেখেছিল। আর ঐ বিশ্রী টাইট স্কার্টটাই যে মূল কারণ তা বুঝতে পেরে হেসে আমাকে বললে, ঠিক করেছেন স্যার, হালফ্যাশানিদের এটাই প্রাপ্য। ভেরাও বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল তা। তাই আর কথা না বাড়িয়ে আমার সঙ্গে থিয়েটারে এলো।

যাই হোক, ডিসেম্বরের শেষে আমরা লন্ডন ছেড়েছিলাম এস. এস. ওয়াশিংটন জাহাজে চড়ে এবং চার পাঁচ দিন পরে পৌঁছেছিলাম আমেরিকা।

নিউইয়র্কে নেমে মনে হয়েছিল যেন অন্যজগত। ছোটবেলায় গাজিপুর থেকে কাশীতে এসে, আবার কাশী থেকে বোম্বাই এসে, এক একটা, পার্থক্য চোখে পড়েছিল। তারপর বোম্বাই থেকে লন্ডন যেন আর একটা ধাপ। আর লন্ডন থেকে নিউইয়র্ক এসে মনে হলো তিরিশ চল্লিশটা ধাপ এক সঙ্গে টপ্‌কে এসেছি।

কানাডা, ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের শো হবে। তবে শুধু বড়-বড় শহরগুলিতে প্রদর্শিত হতো 'রাধাকৃষ্ণ' ও 'হিন্দুবিবাহ' ব্যালে দুটি, - - কাজেই আমার সুযোগ হতো ওদের শো দেখার। শুধু দেখা নয়, এই সময়ই তো স্টেজ-ক্রাফট্-এর বিষয় অনেক কিছু জানতে পারি। আমেরিকায় পাবলোভার ইম্প্রেসারিও ছিলেন মিঃ সলোমন হিউরক। জাতিতে ইনিও রুশ। এই ভদ্রলোক পরে আমারও ইম্প্রেসারিও হয়েছিলেন।

আমরা উনিশশ' তেইশ সালের এক জানুয়ারি গেলাম আমেরিকায়। কী আনন্দ-উৎসব হয় ঐদিন। - - আমরা ট্রুপের ছেলেমেয়েরাও দেখতে বেরোলাম সেই উৎসব। টাইমস্ স্কোয়ারে সবাই একসঙ্গে মিলে সে কী আনন্দ। নিতান্ত অপরিচিত যে, তাকেও যেন লাগে কতদিনের চেনা। ভেঁপুর মত ছোট-ছোট বাঁশি সকলের হাতে। ছেলেমানুষের মত এ ওর কানের কাছে বাজিয়ে দিচ্ছে ভেঁপু, আর 'হ্যাপি ন্যু ইয়ার' 'হ্যাপি ন্যু ইয়ার' বলে সাদর সম্ভাষণ করছে এ-ওকে।

চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে লক্ষ্য করছিলাম পাবলোভার পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে শহরটা। 'রাধাকৃষ্ণ' 'হিন্দুবিবাহ' এবং আমার নামের উল্লেখও তাতে রয়েছে দেখলাম। মনের মধ্যে কেমন একটা ভয়-ভয় করছিল। কিন্তু শো-এর সময় সেটা কেটে গিয়ে একটা আত্মবিশ্বাস মনের মধ্যে দৃঢ় হলো। স্বাধীনভাবে কাজ করার, নিজের দল গড়ার যে একটা বীজ এতদিন স্বপ্নের মত ছিল, সেটা যেন সত্যিই অঙ্কুরিত হলো এবার। কারণ লন্ডনের মতো আমেরিকাকেও সাদরে গ্রহণ করেছিল 'রাধাকৃষ্ণ' ও 'হিন্দুবিবাহ' ব্যালে দুটিকে, সেই সঙ্গে আমাকে। একটু গর্ববোধ যে হয়নি আমার তা নয়। তবে পাবলোভার সঙ্গে থাকতে থাকতে এটা অনুভব করেছিলাম যে, শুধু স্বপ্ন নিয়ে কিছু হবে না। নতুন-নতুন সৃষ্টির স্বপ্নকে দিনরাত পরিশ্রম করে তাকে বাস্তবায়িত করতে হবে, তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে, বহন করে নিয়ে যেতে হবে দিকে-দিকে।

ভাবলাম – লন্ডনে ফিরে গিয়েই কাজ শুরু করবো। শকি ও অ্যাডালেট্ তো আমার সঙ্গে কাজ করতে চায়, কাজেই ওদের নিয়ে আরম্ভ করবো। আমেরিকায় ওরা আসতেই পারেনি। কারণ ওদের চুক্তি আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

আমেরিকায় পাবলোভার জনপ্রিয়তা যে কী ছিল তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আমেরিকায় এক শহর থেকে অন্য শহরে যাতায়াতের সুবিধার জন্য এক বিশেষ ট্রেন ব্যবস্থা আনা পাবলোভার জন্য হয়েছিল এবং ট্রেনের গায়ে সোনালী অক্ষরে লেখা থাকতো পাবলোভা এক্সপ্রেস।

একবার ঐ ট্রেনে যেতে-যেতেই ঘটলো এক ঘটনা। আমরা যাচ্ছি শিকাগো। হঠাৎ দেখি দুটি ছেলের মধ্যে কি নিয়ে যেন কথা কাটাকাটি হলো। তারপর শুরু হলো ঝগড়া। দেখতে দেখতে তা গিয়ে দাঁড়ালো মারামারিতে। মারের চোটে কপালে, গালে, চোটও লেগেছে ওদের। ভাবলাম, ওদের হয়ে গেল আজ, – বারোটা বেজে গেল হাঙ্গেরীয় ব্যালেটির। ছেলে দুটি অংশ নেয় হাঙ্গেরীয় ব্যালেতে দুই বন্ধু হিসেবে। এবং আমোদ আহ্লাদ করে বলতে গেলে তারাই জমিয়ে রাখে ব্যালেটিকে। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে তো মনে হয় মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল। মনের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তি নিয়েই অপেক্ষা করতে লাগলাম সেদিনের শো-এর জন্য। যথাসময় শিকাগোয় পৌঁছে গেলাম থিয়েটারে। ছ'টার সময় শুরু হলো শো। এবারে হবে হাঙ্গেরীয় ব্যালেটি। ছেলে দুটিরই প্রথমে ঢোকার কথা হাতে হাত দিয়ে। ওরা দু'জন গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে আছে সাইড উইং-এর ধারে। অর্কেস্ট্রা বেজে উঠলো, ছেলে দুটি ঢুকলো। কিন্তু কারা এলো স্টেজের উপর? এত হাসিখুশি, আনন্দোচ্ছল, এরা কারা? অন্যান্য দিনের চেয়েও যেন বেশি প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে এদের। অদ্ভুত! আমার চোখে জল এসে গেল। একেই বলে আর্টিস্ট। যদিও কপালে ও গালে প্লাস্টার সাঁটা, তবুও কত সজীব স্বতঃস্ফূর্ত মুভমেন্ট! দর্শকদের কেউ জানতেও পারলেন না যে, মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে পরস্পরকে গালাগাল করে মারপিট করেছে ওরা!

এই মুহূর্তে ওদের মনের ভেতরকার দ্বেষ-রাগ, শত্রুতা, সব ভেসে গেছে তাদের শিল্পবোধের কাছে। আর সব সত্ত্বা ডুবে গিয়ে বড় হয়ে উঠেছে তাদের শিল্পীসত্ত্বা। তাদের এই দৃষ্টান্ত সকল আর্টিস্টদেরই অনুসরণ করা উচিত।

নতুন নতুন শহরে গিয়েই আমার কাজ ছিল খোঁজ নিয়ে মিউজিয়াম, আর্টগ্যালারী কিংবা লাইব্রেরীতে চলে যাওয়া। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়তাম। সারাদিনে ঘুরে-ঘুরে বিকালে সময় মত থিয়েটারে যেতাম। লাঞ্চ বাইরেই সেরে নিতাম। এই বেরিয়ে পড়ার ব্যাপারে কখনও সঙ্গী পেতাম, কখনও পেতাম না। কিন্তু নতুন শহরের কোন মিউজিয়াম আমি বাদ দিতাম না। অন্যরা সবাই বাজার করে, এটা-ওটা কিনে সময় কাটাতো। তাই ওরা আমাকে প্রায়ই ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করতো, 'কি মিঃ শঙ্কর, আজ কোথায় গিয়েছিলে?'

এমনি নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে দিন কাটতে লাগলো। প্রতিটি অভিজ্ঞতাই আমার পরবর্তী জীবনে কাজে লেগেছিল। শো-এর সময় দেখতাম - - স্থানীয় লোক ভাড়া নেওয়া হতো। তাদের বলে একস্ট্রা। ব্যালের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির আর্টিস্ট ঠিকই থাকে, কিন্তু বাদ বাকি যে লোকের দরকার হয় তা সাধারণতঃ নেওয়া হয় ঐ একস্ট্রা থেকে। এটা ওদেশের খুব প্রচলিত রীতি একটা। এই একস্ট্রারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করতো কিছুক্ষণ রিহার্সালের পর।

প্রতিদান

তিমিরেন্দু রায়চৌধুরী

হঠাৎ চোখাচোখি। সারা শরীর কেঁপে উঠল অমিতের। পুলকে নয়, ভয়ে। আড়চোখে একবার তাকাল সুকন্যার দিকে। গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে শরীরটাকে ধনুকের মত বেঁকিয়ে, ডান হাতে হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে আছে সুকন্যা। ওর স্লিভলেসের ভিতর থেকে পৈতেটা উঁকি মারছিল। পাক্কা পঁয়ত্রিশ টাকা খরচা করে নিউ মার্কেট থেকে এই জাপানী ব্রেসিয়ারটা কিনেছিল সুকন্যা। সেদিন সঙ্গে অমিতও ছিল, কিন্তু সুকন্যা অমিতকে দোকানের ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। বলেছিল, 'তোমার পাশে দাঁড়িয়ে দোকানীর সামনে এই সব জিনিস কিনতে আমার লজ্জা করবে না বুঝি?'

অন্য দিন হলে যেভাবেই হোক সুকন্যাকে ওর [illegible] স্খলনের ব্যাপারটা টের পাইয়ে দিত অমিত। এর আগে দিয়েওছে বহুবার। অমিতের, কেন জানে না, মনে হয়, মেয়েরা ইচ্ছে করেই ব্রা দেখাতে ভালবাসে। অন্তত ওর নিম্ফোম্যানিয়াক কলেজের বান্ধবী শুভ্রা তো বাসতই। মেয়েরা দেখাতে ভালবাসে, আর অমিত কি দেখতে ভালবাসে না?

আলবাৎ বাসে। কিন্তু নিজের বৌ-এর বেলায় নয়। অন্তত এই প্রকাশ্য দিবালোকে এক বাস লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে তো নয়-ই। বৌ-এর ব্যাপারে অমিত সাংঘাতিক পসেসিভ, অন্য সব ব্যাপারে যতই আধুনিক হোক না কেন। পার্টি-টার্টিতে অমিত ইচ্ছে করেই সুকন্যাকে নিজের বাহুসংলগ্না করে রাখে। মাঝে মাঝে সুকন্যাই এতে বিরক্ত হয়। 'আরে বাবা, পাঁচ বছর প্রেম করে বিয়ে করা বৌ-এর উপরেও এতটুকু বিশ্বাস নেই?'

বিশ্বাস আছে, তবু ভয় হয়। ওদের এই সাত বছরের সম্পর্কে সুকন্যা এমন কিছু করে নি, যাতে ওর সম্পর্কে অমিতের বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস জন্মাতে পারে। কেবল ওর ছোটবেলার প্রেমিক অভিজিতের কথা তুললে সুকন্যার মুখটা তখনও লাল হয়ে যায়। অবশ্য ছোটবেলায় ও রকম দু-চারটে খুচরো প্রেম সবাই করে। অমিতও করেছে। অভিজিতের নাম করলেই সুকন্যা, ঝুমরুর নাম করে। বলে 'লেকে বসে ঝুমরুর সঙ্গে তোমার ফষ্টিনষ্টির কথা আমি ভুলে গেছি ভেবেছ?' তারপর দুজনেই হাসে, হাসতে হাসতে আঁচল ধরে ওকে কাছে টেনে নিয়ে আসে অমিত, সুকন্যার বুকে বুনো মোষের মত মাথা ঘষে।

কিন্তু আজ সুকন্যার দিকে তাকাবারও সাহস হচ্ছে না অমিতের। ওর দিকে তাকাতে গেলে আবার যদি চোখাচোখি হয়? কিংবা দুম করে যদি জিজ্ঞাসাই করে বসে, কেমন আছেন? আর ভাবতে পারছিল না অমিত। গলা শুকিয়ে কাঠ। একটু জল খেতে পারলে ভাল হত। একবার মনে হল, সুকন্যাকে ডেকে নিয়ে বাস থেকে নেমে পড়বে। বলবে এইভাবে গরু-ছাগলের মত দমবন্ধ অবস্থায় বাসে যেতে ভাল লাগছে না ওর।

বললে হয়ত কথাটা অবিশ্বাসও করবে না সুকন্যা। দু'বছরের বিবাহিত জীবনে ওরা প্রায় বাসেই ওঠে নি। বিয়ে করার বছর খানেক আগে থেকেই অমিত অফিসের গাড়ি পাচ্ছে। তাছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি, জীবন বলতে এখন শুধুই অফিস। নিজের দিন কেবল রবিবার। তাও সব রবিবার নয়। বোম্বের হেড অফিসের বড় বড় কর্তারা প্রায়ই রবিবার কলকাতায় ভিজিট দিতে আসেন। এয়ারপোর্টে গিয়ে রিসিভ করা থেকে আবার এয়ারপোর্টে গিয়ে তুলে দিয়ে আসা পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরতে হয় অমিতকে। ফাই-ফরমাশ খাটতে হয়। এর মধ্যেও একআধটা রবিবার ফাঁকা থাকলে সুকন্যাকে নিয়ে সিনেমা-থিয়েটারে যায় অমিত। তারপর কোনো বড় হোটেলে বসে ডিনার সেরে বাড়ি ফেরা। মালটিন্যাশনালের উঠতি একজিকিউটিভ অমিত নবোঢ়া স্ত্রীকে ট্যাক্সি চড়ায়। বহুবার আপত্তি করেছে সুকন্যা। 'মিছিমিছি এতগুলো টাকা ট্যাক্সির পিছনে উড়িয়ে কী লাভ? একটু একটু করে জমালেও তো পার!'

সুকন্যার এই অভিযোগ, অমিতের মনে হয়, ওদের মধ্যবিত্ততার প্রতি কটাক্ষপাত। সুকন্যার বাবার নিজের দু'দুটো অ্যামবাসাডার আছে। একটা নিজে ব্যবহার করেন, অন্যটা বাড়িতে থাকে। বিয়ের আগে কোনোদিন মাটিতে পা পড়েনি সুকন্যার। অমিতের বেশ মনে আছে। ইঞ্জিন বিভ্রাটের জন্য একদিন বিকেলে সময়মত সুকন্যার কলেজে পৌঁছতে না পারায় ওর বাবা ড্রাইভারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছিলেন। একমাত্র মেয়ের জন্য এত দরদ ছিল সুকন্যার বাবার।

সেই সুকন্যা যখন বলে, ট্যাক্সি চড়ে কী লাভ, অমিতের রক্তের চাপ বেড়ে যায়। অমিত বুঝতে পারে, কটাক্ষটা তার প্রতি নয়, তার রিটায়ার্ড স্কুল টিচার বাপের প্রতি। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ইদানীং প্রায়ই সুকন্যা অনুযোগ করে, জান, তুমি যে মার্চেন্ট ফার্মে চাকরি কর, রাত-বিরেতে মুখে মদের গন্ধ নিয়ে বাড়ি ফের, ট্যাক্সি হাঁকাও, এসব তোমার বাবার একদম পছন্দ নয়। বাবার স্থির বিশ্বাস আমাকে বিয়ে করেই তুমি উচ্ছন্নে গেছ।'

অমিত জানে ও উচ্ছন্নে যায় নি, কিন্তু এটাও জানে বাবার ধারণা খুব মিথ্যে নয়। সুকন্যার প্রেমে না পড়লে অমিতের জীবনটা হয়ত সত্যিই অন্যরকম হত। দূর মফঃস্বল শহরে কোনো অখ্যাত কলেজে এখন ছাত্র-ঠ্যাঙাত অমিত। বাবার ইচ্ছামত। কিন্তু সুকন্যার ইচ্ছে ছিল অন্যরকম। তাই ও একজিকিউটিভ হয়েছে। হয়েছে মানে, সুকন্যার বাবা করে দিয়েছেন। কোনো পরীক্ষায় বসতে হয় নি, কাউকে ইন্টারভিউ দিতে হয় নি। অ্যাপ্লিকেশন হাতে করে নিয়ে গিয়েছিল সুকন্যা, বাড়ি বয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে গিয়েছিল অফিসের বেয়ারা। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা হাতে পেয়ে একটু লজ্জা হয়েছিল বই কি অমিতের—এইভাবে প্রেমিকা-ভাগ্যে চাকরি লাভ করার জন্যে। তাতে কি! সুকন্যাকে অমিত ভালবাসে, আর ভালবাসার জন্য কোন কিছু করাই অন্যায় নয়!

কিন্তু বাবা সেকথা বোঝেন না। বুঝলেও মেনে নিতে পারেন না কিছুতেই। একমাত্র ছেলে সব হিসেব এভাবে গোলমাল করে দেবে, কোন্ বাবাই সেটা মেনে নেন? অমিত বাবার কষ্টটা বুঝতে পারে। বুঝতে পেরে বাবার জন্য একটু দুঃখও হয় অমিতের। সত্যিই, মনে মনে সায় না থাকলেও, এ পর্যন্ত কোনো ব্যাপারেই বাবা প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন নি। মার্চেন্ট ফার্মে চাকরি, বিয়ে, বিয়ের পর শ্বশুরের পয়সায় কাঠমুণ্ডুতে হনিমুন কোনো কিছুতেই। বাবার ব্যবহারের যোগ্য প্রতিদানও দিয়েছে অমিত। সুকন্যাকে নিয়ে আলাদা এস্টাবলিশমেন্ট না করে, বাবা-মার সঙ্গে একই ছাদের তলায় রয়েছে। অবশ্য এটাও সম্ভব হয়েছে সুকন্যার জন্যই। সুকন্যা আজ পর্যন্ত এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও বাসা করার আবদার করে নি। করলে, অমিত কী করত? সুকন্যাও বোধহয় বোঝে বাবার কষ্টটা। ওর জন্যই যে অমিত জীবনটাকে সম্পূর্ণ অন্য জোয়ারে ভাসিয়েছে সুকন্যা সেটা জানে। জানে বলেই যতদূর পর্যন্ত পারে অ্যাডজাস্ট করে থাকতে চেষ্টা করে। বিয়ের আগে বাড়িতে কাপ্তান পরত, এখন পরে না। শাড়ি পরে। অমিতের মার জন্য হাতে শাঁখা আর নোয়াও রাখে সর্বক্ষণ।

তবু বাবা মাঝে মাঝে বেচাল কথা বলে ফেলেন। বাবার ওই মস্ত দোষ। নিজের যেটা বিশ্বাস, নিজের যেটা মূল্যবোধ, সেটাকেই ধ্রুব বলে মানেন। সময়টা যে বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে জীবনদর্শন, গায়ের চামড়ায় আগুনের ছেঁকা খাওয়ার মত করে টের পেয়েও বাবা মুখ ফিরিয়ে রাখতে ভালবাসেন। এই তো সেদিন সকালের কাগজে ট্যাক্সি ভাড়া বৃদ্ধির খবর পড়ে সুকন্যা যখন সরকারের মুণ্ডুপাত করছিল, বাবা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন: তোমরা ট্যাক্সি চড়, তোমাদের দুশ্চিন্তা হতে পারে। ট্যাক্সির ভাড়া বাড়লে আমার খুব আনন্দ হয়। যত পয়সা ভাড়া বাড়ে, আমার তত পয়সাই বাঁচে। সুকন্যার মুখটা বাবার কথা শুনে কালো হয়ে গিয়েছিল। ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল অমিতের। বাবা আর বৌ-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে এমন অস্বস্তিতে মাঝেমাঝেই পড়তে হয় অমিতকে। অমিতের ভাগ্য ভাল, ওর সুন্দরী বড়লোক বৌ হতভাগ্য স্বামীর দুরবস্থাটা বোঝে। আর সেজন্যই তো সুকন্যাকে এত ভালবাসে অমিত।

আজও পেলে ট্যাক্সিতেই চড়ত অমিত। ফুটুনি মারার জন্য নয়, স্রেফ প্রয়োজনে। অফিসে বের হওয়ার ঠিক আগেই সুকন্যার বাড়ি থেকে টেলিফোনটা এল। ফোন ধরেছিল অমিত নিজেই। সুকন্যাদের বাড়ির বহুদিনের কাজের লোক সুধীরদা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'শীগ্‌গিরই একবার এবাড়িতে আসুন। মা বাথরুমে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন। বাবু কলকাতার বাইরে। আমি পাড়ার ডাক্তারখানা থেকে ফোন করছি।'

খবরটা দেবে কি দেবে না ভাবতে ভাবতে, টাই হাতে সুকন্যা সটান সামনে এসে দাঁড়াল অমিতের। অমিত খবরটা দিয়েই ফেলল। আর কোন কথা বলার সুযোগই দিল না সুকন্যা। যে শাড়িটা পরে ছিল সেটাই একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে বলল, 'চলো।'

অফিস টাইম। বাসস্ট্যান্ডে গিজগিজ করছিল লোক। কে বলে দেশে বেকার সমস্যা আছে? ফাঁকা ট্যাক্সি একটাও পাওয়া গেল না। চেষ্টা-চরিত্র করলে শেয়ার ট্যাক্সি একটা মিলতেও পারত। কিন্তু এ সময় কলকাতার সব রাস্তা ডালহৌসিমুখী, সল্ট লেক থেকে যোধপুর পার্কে যেতে কেউ রাজি হত না।

অবশ্য আর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলেই অফিসের গাড়িটা চলে আসত। কিন্তু খবরটা শোনার পর সুকন্যার মুখের চেহারাটা যা হয়েছিল তাতে মুখ ফুটে সে কথাটা বলার সাহস হয় নি অমিতের। তাছাড়া অফিসে আজ জরুরি কাজও ছিল অনেক। সামনেই ইয়ার এন্ডিং। গত তিনদিন স্রেফ অফিস থেকে বের হতেই রাত সাড়ে-ন'টা হয়ে গেছে। ক্লাবে যেতে পারেনি একদিনও।

বাসস্ট্যান্ডে মিনিট পাঁচেক দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ভক ভক কালো ধোঁয়ায় চারপাশ অন্ধকার করে দিয়ে একটা একতলা বাস এসে দাঁড়াল। লাল রঙের স্টেটবাস। এই সেদিন বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় বাসগুলো কেনা হয়েছে। এরই মধ্যে এই দশা। অমিতের মনে পড়ল বাসে লাল রঙ করা নিয়ে আনন্দবাজারে বেশ কয়েকটা চিঠি চাপাটি ছাপা হয়েছিল।

নাকে রুমাল চাপা দিয়ে অমিত দেখল সুকন্যা বাসে ওঠার চেষ্টা করছে। এই ভিড়ের মধ্যে ওকে বারণ করবার ফুরসতও জুটল না। অগত্যা বাধ্য ছেলের মত বৌকে নিঃশব্দে অনুসরণ করতে বাধ্য হল অমিত। যেমনটা সারা জীবন করে এসেছে।

উঠেই চোখাচোখি। হাড়ের মধ্যে এই ভ্যাপসা গরমে বরফ-হাওয়া খেলে গেল যেন। মনে মনে ভাবল, শালা কপাল যখন মন্দ হয়....।

এত চকিতে ঘটনাটা ঘটে না গেলে বাসের

প্রথম গেট দিয়ে কিছুতেই উঠত না অমিত। কলকাতাই বোধহয় পৃথিবীর একমাত্র সভ্য শহর যেখানে বাসে মেয়েদের জন্য আলাদা জায়গা চিহ্নিত থাকে। অমিত জানত প্রথম গেট দিয়ে বাসে ওঠা মানেই মেয়েদের জঙগলে গিয়ে পড়া। কলেজে পড়ার সময় থেকেই এই ব্যাপারটা সন্তর্পণে এড়িয়ে এসেছে অমিত। ও দেখেছে দ্বিতীয় গেটে জায়গা থাকা সত্ত্বেও যেসব পুরুষ মানুষ প্রথম গেট দিয়ে বাসে ওঠে মেয়েরা তাদের ভাল চোখে দেখে না। একবার তো অমিতরা তিন বন্ধু মিলে বাবার বয়সী একজন ভদ্রলোককে হিড়হিড় করে টেনে বাস থেকে নামিয়েই দিয়েছিল।

হঠাৎ ব্রেক। ড্রাইভারির পরিভাষায় সাডন্ ব্রেক। ভারসাম্য হারিয়ে হুড়মুড় করে একে অন্যের ঘাড়ে। সামলে নিয়ে হ্যান্ডেল ধরতেই অমিত দেখল যে মেয়েটার একেবারে মুখোমুখি এসে পড়েছে। পাশেই সুকন্যা। ভিড় বাসে ড্রাইভার হঠাৎ ব্রেক কষলে, কিভাবে যেন জায়গা বেড়ে যায়। ভাল করে দাঁড়াতে পেরে অমিতের অস্বস্তি যেন আরও বেড়ে গেল।

এবার নিশ্চয়ই মেয়েটা কথা বলবে! ভয়ে হাত পা পেটের ভিতর ঢুকে যাচ্ছিল অমিতের। প্রশ্ন করলে কী জবাব দেবে ও! তার চেয়েও বড় কথা সুকন্যা জিজ্ঞেস করলে কী পরিচয় দেবে মেয়েটির! দূর সম্পর্কের মামাতো বোন! সুকন্যা তাতে ভুলবে না। আরও হাজারটা প্রশ্ন করবে। একটা মিথ্যে বলতে গিয়ে হাজারটা মিথ্যে বলতে হবে। আর সুকন্যা যদি টের পেয়ে যায় আসল ঘটনাটা কি! আর ভাবতে পারছিল না অমিত।

ভয় নয়। এবার অমিতের রাগ হল রণজিৎ বাবুর ওপর। ওদের অফিসের সাপ্লায়ার। অনেক দিন ধরেই অমিতকে ডিনার খাওয়ানোর পাঁয়তারা করছিলেন রণজিৎ বাবু।

অনেকদিন এড়িয়ে গিয়েও সেদিন আর এড়াতে পারল না অমিত। নেশাগ্রস্ত হওয়ার পর নিশিগ্রস্ত হোল যেন। রণজিৎ বাবুর প্রস্তাব শুনে প্রথমে অবশ্য ওই নেশার ঝোঁকেও মোরগের মতো মাথা ঝাঁকিয়েছিল অমিত। 'নো নো, ইম্পসিবল। আই ক্যান নট সিম্পলি ডু দ্যাট। গট এ ওয়াইফ অ্যাট হোম, হু মাস্ট অলরেডি বি ওয়ারিড।' রণজিৎ বাবু কথাটা শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলেন। 'দে আর অলসো ওয়েটিং। আই থট ইট উড বি ফ্রি ফ্রম দিজ মিডল ক্লাস সিলি ইনহিবিশনস।'

মিডল ক্লাস! এর চেয়ে শুয়োরের বাচ্চা বললে কম অপমানিত বোধ করত অমিত। মাল্টিন্যাশনালের সাড়ে চার হাজারি এক্সিকিউটিভ রণজিৎ বাবু বললেন মিডল ক্লাস! কথাটা শুনে তখন রক্তে অ্যালকোহলের কণাগুলো ফণা তুলেছিল অমিতের! তখন বাসের মধ্যে সেই রক্তই বরফ–শীতল। হয়ত ঠিকই বলেছিলেন রণজিৎ বাবু! নইলে শাশুড়ির অসুখের কথা না–ভেবে এই ভিড়ে মিছিমিছি এই মেয়েটাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় মাথার চুল ছিঁড়তে কেন ইচ্ছে করছে ওর?

তবু–ছাড়াতে চাইলেই কি ছেড়ে যায় দুশ্চিন্তা? কী যেন নাম বলেছিল মেয়েটা? অমিতের মনে পড়ল, প্রথমে নাম বলতে চায় নি। জিজ্ঞেস করাতে একগাল হেসে বলেছিল, 'আমাদের নাম থাকে না। এক এক বাবু এক একটা নাম দেয়।' তারপর হঠাৎ চোখের পলকে হাসি গিলে ফেলে ঝাঁঝালো গলায় বলেছিল, 'আপনার নামে কী দরকার। যে জন্যে এসেছেন তা সেরে চলে যান। বেশি সোহাগ দেখাবেন না।'

অমিত তবু ছাড়েনি। আসলে নেশা করার ওই একটা মস্ত বিপদ। একবার যেটা মাথার মধ্যে ঢোকে, নেশা ছাড়ার আগে কিছুতেই সেটা মাথা থেকে বের হতে চায় না। অমিতের পীড়াপীড়ির জন্যই হোক, আর ঝামেলা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দেওয়ার জন্যই হোক, মেয়েটা শেষ পর্যন্ত নাম বলেছিল 'মল্লিকা।' মল্লিকা! শুনেই গান গেয়ে উঠেছিল অমিত–আমার মল্লিকা বনে যখন প্রথম ধরেছে কলি। মেয়েটাও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল অমিতের এই হাতেখড়ি হল।

তখন বিশ্বাস হয়েছিল নামটা। এখন অমিতের মনে হচ্ছে, মেয়েটা ডাহা মিথ্যে কথা বলেছিল। মিথ্যে কথা কি অমিতও বলে নি? আলো নেবানোর আগে অমিতের পেট–মোটা মানিব্যাগটা দেখার পর থেকেই সোহাগে গলে গলে পড়ছিল মেয়েটা। গালে গাল রেখে কত কথা তখন! কথায় কথায় মেয়েটা জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার বাড়িতে বৌ নেই?' প্রশ্নটা শুনে অন্তত দশ সেকেন্ডের জন্যে নেশা কেটে গিয়েছিল অমিতের। চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল সুকন্যার মুখটা। টেলিভিশন দেখতে দেখতে নিশ্চয়ই বার বার জানালার দিকে তাকাচ্ছে সুকন্যা। অমিত বলতে পারত সত্যি কথাটা। বললে কোনও ক্ষতিও হত না অমিতের। তবু অমিত মিথ্যে বলল। 'বিয়ে? বৌ? বিয়ে আবার কোনও

ভদ্দরলোকে করে না কি?'

কেন মিথ্যে কথা বলেছিল সেদিন? এখন সামনে বসে মেয়েটা কি বুঝতে পারছে না অমিতের পাশে দাঁড়ানো ভদ্রমহিলাটি ওরই স্ত্রী? ছিছি একটা বেশ্যার কাছেও ছোট হতে হোল শেষ পর্যন্ত! তাহলে কেন সেদিন সত্যি কথাটা বলল না অমিত? কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল! তাহলে কি এটাও অমিতের মিডল ক্লাস ইনহিবিশন্?

কোমরে হঠাৎ খোঁচা। 'শুনতে পাচ্ছ না, কন্ডাক্টর টিকিট চাইছে? সুকন্যার কথায় সম্বিৎ ফিরে এল অমিতের। পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়ে আবার নিজের অজান্তে চোখ পড়ে গেল মেয়েটার দিকে। জানালার বাইরে মুখ রেখে, অমিতের মনে হোল, মেয়েটা যেন মিচকি মিচকি হাসছে।

কপালের রগ ফুলে উঠল অমিতের। মেয়েটা তাহলে সত্যিই দেখেছে না কি? দেখেছে শুধু নয় চিনতেও পেরেছে? আর চিনবে নাই বা কেন? মাঝে তো মাত্র কেটেছে চারটে রাত। তাহলে? তাহলে কি অমিতের অস্বস্তিটাও টের পাচ্ছে মেয়েটা? তাই মুচকি হাসি? শালী....! মনের দাঁতে দাঁত ঠক ঠক করতে করতে পকেট থেকে হ্যাঁচকা টানে মানিব্যাগ বার করতে গিয়ে কয়েকটা খুচরো পয়সা নিচে পড়ে গেল। কিন্তু তেমন আওয়াজ হোল না। কয়েকশ মানুষের পা তখন বাসের মেঝেতে চামড়ার কার্পেট পেতেছে।

খুচরো পয়সার আওয়াজ না হওয়ায় স্বস্তি পেল অমিত। নইলে মেয়েটার সঙ্গে নির্ঘাত চোখাচোখি হয়ে যেত। চেষ্টা করে নিজের রাগ নিজেই দমন করল। ঠিক যেন নিজের থুথু নিজে গেলা। এমনও তো হতে পারে মেয়েটা সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবছে? ওর বর্ধমানের বিধবা মায়ের কথা? কিংবা কাল রাত্তিরে সল্ট লেকে যে বাবুর বাড়িতে রাত কাটাতে এসেছিল, তার কথা? শালা সব ব্যাটাছেলেই সমান। হঠাৎ নিজের উলঙ্গ শরীরটা চোখের সামনে ভেসে উঠল অমিতের। ও বেচারার কী দোষ?

এবার মেয়েটার জন্য কষ্টই হোল অমিতের। ঘরে ঢুকে প্রথমে মনে হয়েছিল মক্ষিরাণীর বাজার বুঝি খুবই রমরমা। সৌখিন ডবল বেডের উপর ধোপদুরস্ত বিছানার চাদর। মাঝখানে হাত খানেকের ব্যবধান রেখে দুপাশে দুটো একই রঙের ওয়াড়ে মোড়া ফোমের বালিশ। যেন কম্পাস দিয়ে মেপে রাখা হয়েছে বালিশ দুটো। খাটের বাঁদিকে ড্রেসিং টেবিল। তার উপরে সাজানো নানা আকৃতির পাউডারের কৌটো। মুখ বের করা দুটো লিপস্টিক। আয়নাটা সাদা কুচেটের ফিনফিনে ঢাকনায় ঢাকা। ডানদিকে স্টিলের আলমারি। কে জানে ভিতরে কী দুর্লভ জিনিস আছে! ঘরের মেঝের রঙ কালচে লাল। ঝকঝকে। আলমারির একপাশে, চট করে চোখে পড়ে না, এমন একটা জায়গায় ঠাকুরের আসন। শঙ্খ। শঙ্খের মাথায় লাল দাগ। নিশ্চয়ই সিঁদুরের। কিন্তু ভগবানের কাছে কী প্রার্থনা করে মেয়েটা? টাকাওয়ালা দরাজ খদ্দের? না এই জীবন থেকে নিষ্কৃতি?

নিষ্কৃতির উপায় থাকলে নিশ্চয়ই এই লাইনে আসত না মেয়েটা। 'তোমার বিয়ে করতে ইচ্ছে করে না?' মেয়েটা জবাবে বলেছিল, 'বিয়ে? সে তো রোজ করছি। কত বাবুই তো উদ্ধারের কথা শুনিয়ে গেল। ব্যস, ওই পর্যন্তই! তারপর সকাল হলে টাকা, আর ছ্যাঁকা।' বলেই কাপড়টা একটু তুলে ধরল মেয়েটা। অমিত দেখল ফর্সা ঊরুর একটু উপরে সিগারেটের দুটো ছ্যাঁকা জলবসন্তের মতো টলটল করছে। 'কাল রাতে একটা বাবু এসেছিল। জাহাজের বাবু। তার আবার অদ্ভুত সোহাগ। বলল, ছ্যাঁকা না দিলে তার নাকি ফূর্তি জাগে না। কী যন্ত্রণা, কী বলব! অবশ্য দুটো ছ্যাঁকায় দুশো টাকা দিয়েছে।'

আবার জোরে ব্রেক কষে বাসটা থামল। থামতেই উঠে পড়ল মেয়েটা। কিন্তু ও কি! অমিত দেখল মেয়েটা সুকন্যার হাতের তালু ধরে ঝাঁকাচ্ছে। সুকন্যা বলল: কিছু বলবেন? মেয়েটা উত্তর দিল না। কেবল চোখ দিয়ে তার ফাঁকা জায়গাটায় সুকন্যাকে বসতে বলে হেলে সাপের মতো ভিড়ের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেল। □

১১২ বছরের এক সন্ন্যাসী

লছমী বাগচি

নবদ্বীপের নিমাই চৈতন্যের জন্মস্থান নামে সুপরিচিত প্রধান মায়াপুরে এখন কিংবদন্তীর মত বেঁচে আছেন যোগাচার্য যোগীপুরুষ শ্রীশ্রী স্বামী যোগানন্দ ভারতী ১০৮ মৌনী বাবা নামেই যিনি পরিচিত। মৌনী বাবাকে ঘিরে নানা গল্প আছে তার সত্যাসত্য বিচারের অপেক্ষায় থাকলেও বর্তমান শিষ্যদের দাবি মৌনীবাবার বয়স এখন একশো বাইশ। মৌনীবাবা শিষ্যদের মধ্যে পরিচিত ও ব্যক্তিগত জীবনে যিনি একজন সুচিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত তিনি হলেন ডাঃ কে.সি. ভট্টাচার্য। তার মতে শ্রীশ্রী বাবার জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে নিন্দুকে যাই বলুক না কেন আমাদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। ধর্ম ব্যাপারটাই বিশ্বাসের। যিনি করলেন ভালো, না করলেও দোষের নয়। মৌনীবাবার জন্ম প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জানালেন "ইংরেজি ১৮৬৪ সালে ফরিদপুরের বিখ্যাত চক্রবর্তী পরিবারের মাতা ক্ষীরদা সুন্দরীর গর্ভেই জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন যোগীপুরুষ।"

"তন্ত্র মন্ত্র ঝাড় ফুঁক বা ভেল্কির খেলা দেখিয়ে মৌনীবাবা নিজেকে কোনদিন জাহির করতে চাননি ইনি এক প্রচার বিমুখ আত্মমগ্ন যোগীপুরুষ যার নিজের জীবটাই অবিশ্বাস্য রকমের ভেল্কি। যখন-তখন সমাধি হয়ে যান। বাবার জীবনে দীর্ঘস্থায়ী সমাধিস্থ হয়েছিলেন দু-বার। একবার আট বছর আর একবার বারো বছর।" মৌনী বাবার জীবন সম্পর্কে অনেক অজানা কথার এই রকম একটি কথা জানালেন নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক সতীন্দ্রকৃষ্ণ দে যিনি বাবার প্রথম সারির শিষ্যদের একজন। মৌনী বাবা এখন তার প্রাচীন মায়াপুরের আশ্রমেই থাকেন। আশ্রম বলতে অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের মঠ বা আশ্রম বাড়ী যে ভাবে বেড়ে উঠেছে সে রকম কোন সুশৃঙ্খল ভাবে গুছিয়ে ওঠা নয়। তবু দর্শনার্থীদের ভিড় এবং প্রণামী যে জমে উঠছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মৌনী বাবা এমনিতেই প্রচার বিমুখ তার ওপর বুদ্ধিজীবী শিষ্য সম্প্রদায়ের অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি আমাদের কাছ থেকে আরো দূরে থেকে যাচ্ছেন। তাই চোখে দেখা আশ্রম বাড়ী সম্পর্কে প্রশ্ন একটাই যোগাচার্য যোগানন্দ ভারতী ১০৮ মৌনী বাবা যেদিন সমাধি থেকে আর বস্তুজগতে ফিরে আসবেন না সেদিন ঐ সমাপ্তির কি নিষ্পত্তি হবে? □

লালবাড়ির রহস্য

কনস্টেবলের দুলাখ টাকার বাড়ি

কমল

জ্যোতিবাবু পুলিশকে নিয়ে বড়ই মুশকিলে পড়েছেন। কারণ পুলিশকে কিছুতেই তিনি বাগে আনতে পারছেন না। মাইনে বাড়িয়ে, 'বোনাস' দিয়েও তিনি এদের মন কাড়তে পারেন নি। ভোটের সময়ও পুলিশের মন গলে নি। তাই এবার পুলিশকে দিয়ে অকাজ কুকাজ করানো যায় নি। পুলিশকে দিয়ে এর আগে বুথ দখল। ব্যালট পেপার পাচারের মহান কাজে লাগানো হলেও এবার এসব কাজে পুলিশের একটা বিরাট অংশের সায় মেলে নি। অন্যান্যবার ওঁরা সোৎসাহে এসব কাজে এগিয়ে আসতেন। এবার কিন্তু হাত গুটিয়ে বসেছিলেন। এবার সব পুলিশই কিন্তু জ্যোতিবাবুদের ভোট দেন নি। সি পি এম প্রভাবিত পুলিশ ইউনিয়নগুলির নেতাদের অত্যাচারে জেরবার হয়ে পুলিশের বিরাট অংশ 'হাতে' ছাপ মেরেছেন। এরাজ্যে ফ্রন্টের ভরাডুবির এটা একটা অন্যতম কারণ। পুলিশকে সাথী করতে পারলে জ্যোতিবাবুদের হয়তো এভাবে হারতে হতো না। পোস্টাল ব্যালট সাধারণত সরকারের বিপক্ষে যায় না। কারণ পোস্টাল ব্যালটে ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় না। কে কাকে ভোট দিল তা জানাজানি হয়ে যায়। মনের কথা অন্যেরা জানতে পারে। তাই পোস্টাল ব্যালট–ক্ষমতাসীন দলের মস্ত সহায়। কিন্তু এবার পুলিশের পোস্টাল ব্যালটের আশীর্বাদ থেকেও জ্যোতিবাবুরা বঞ্চিত হয়েছেন।

কলকাতা পুলিশের ২৬ হাজার এবং জেলা পুলিশের ৮০ হাজার অর্থাৎ এক লাখ ছয় হাজার কর্মী তাঁরা সবাই ফ্রন্টকে এবার ভোট দেননি। এদের একটা বিরাট অংশ ভোট দিয়েছেন কংগ্রেসকে। এঁরা তো বটেই এঁদের পরিবারের লোকেরাও ফ্রন্টের প্রতি বিমুখ হয়েছেন।

কিন্তু কেন? ফ্রন্ট রাজত্বে ইউনিয়ন নেতাদের রামরাজত্ব কায়েম হয়েছে। জ্যোতিবাবুরা বলেছেন, কেন, আমরা ওঁদের ট্রেডইউনিয়ন করার দাবিদাওয়া স্বীকার করে নিয়েছি। ছুটির দিনে কাজকরার বদলে টাকা দিচ্ছি, পে কমিশনের সুপারিশ মত বহু মাইনে পত্র বাড়িয়ে দিয়েছি কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদের মন গলাতে পারলাম না। কিন্তু জ্যোতিবাবুদের জানা উচিত ছিল যে, পুলিশের মাইনে বাড়ালেও ওঁরা ওঁদের মর্যাদা বাড়াতে পারেন নি। ইউনিয়নের দাপটে পুলিশ জগন্নাথ হয়ে বসে আছে। কী কলকাতায় কী জেলায় সর্বত্রই শেষ কথা ইউনিয়ন। পার্টি ছাড়া কথা নেই। জেলার এস পিরা পুলিশনেতাদের কথায় ওঠবোস করেন। কারণ ভাল পোস্টিং পেতে গেলে পুলিশনেতাদের শুভেচ্ছা দরকার। পুলিশে চলছে দলবাজি, খেয়োখেয়ি। যার নাম দেওয়া হয়েছে শ্রেণী সংগ্রাম। একদিকে সিপিএম অন্যদিকে নন–সি পি এম। ফলে প্রশাসন ভেঙে পড়েছে।

কলকাতা পুলিশের কথাই ধরা যাক। কলকাতা পুলিশ এসোসিয়েশনের মত ছাড়া পুলিশ কমিশনারের একচুলও এগোবার ক্ষমতা নেই। এই এসোসিয়েশনের সভাপতি একজন সি আর ও। কনস্টেবল এবং এস আইদের বদলির ব্যাপারে তাঁর প্রভাব অনেকখানি। এসোসিয়েশনের সম্পাদক কনস্টেবল হয়েও শক্তিশালী লোক। এঁদের কথা অমান্য করে কার সাধ্য? এমন কি পুলিশ কমিশনারকেও এদের কথায় সায় দিয়ে চলতে হয়। সমিতির নেতাদের ওসি অদলবদলের তালিকাটি আসলে তৈরি হয়ে আসে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে। সুতরাং সমিতির নেতাদের তোয়াক্কা না করে পুলিশ কমিশনার কিংবা সদর ডিসির উপায় নেই। আসলে এই সমিতিই লালবাজার আর আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের মধ্যে যোগাযোগ রেখে চলে। পার্টির কথাবার্তা লালবাজারের কর্তাব্যক্তিদের কানে এরাই পৌঁছে দেয়। আবার পুলিশকর্তাদের বক্তব্য এরাই পৌঁছে দেয় আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে। এই সমিতির শাখা প্রশাখা কলকাতা পুলিশের প্রতিটা ডিভিশনে প্রসারিত। থানা, ট্রাফিক পুলিশের প্রতি বিটে সমিতির উপশাখা ছড়িয়ে পড়েছে। ট্রাফিক কনস্টেবলের পয়সাওয়ালা পোস্টিং পেতে গেলে নেতাদের সেলাম দিতে হয়। ফান্ডে চাঁদা দিতে হয়। একজন ট্রাফিক কনস্টেবলের ভাল পোস্টিং পেতে গেলে নেতাদের হাজার পাঁচেক টাকার প্রণামী দিতে হয়। নেতারা এখন এই প্রণামী হাতিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠছেন। বাড়ি, টি ভি কিনেছেন। কেউ কেউ আবার ডব্লিউ বি ওয়াই মার্কা গাড়ি কিনে তা ভাড়া খাটাচ্ছেন। এক নেতা কলকাতার কাছে দুই লাখ টাকা দিয়ে সম্প্রতি বাড়ি কিনেছেন। পদাধিকারে তিনি একজন কনস্টেবল। কিন্তু পুলিশনেতা হওয়ায় তাঁর সব অপকর্মই মাপ হয়ে গেছে। কিন্তু সাধারণ পুলিশদের এসব কাজ ভাল লাগে নি। তাঁরা ভাল মনে এসব অপকর্ম মেনে নিতে পারেন নি। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরা। এই সব পুলিশনেতারা ট্রেডইউনিয়নের নাম করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছেন। এদের নির্দেশ না মেনে চললে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে হোমগার্ডের কানাগলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অথচ সাতজন পুলিশনেতা যাঁদের কংগ্রেসী আমলে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে চাকরি গিয়েছিল তাঁদের আবার চাকরিতে বহাল করা হয়েছে। বাণপ্রস্থে চলে যাবার পরেও অবসর থেকে তাঁদের ডেকে এনে জ্যোতিবাবুরা চাকরি দিয়েছেন। লালবাজারের অপুলিশ কর্মীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কো–অর্ডিনেশন কমিটির নেতাদের উপর। তাঁদের তোয়াজ করতে পারলে আর্মস অ্যাক্ট, গোয়েন্দা পুলিশ, সিনেমা, ট্রাফিকের–রেড সেকশনে কেরানি পদ অলংকৃত করা যায়। এদের এক নেতার এমনই দাপট যে, প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার নিরুপম সোমকে তিনি হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, আমার কথা না শুনলে আপনাকে সরে যেতে হবে। ভালমানুষ নিরুপমবাবু তখন তাঁর হুমকি হজম করে গিয়েছিলেন। এ নিয়ে পুলিশ মহলে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল। কিন্তু কেউ কোন কথা বলে নি। শেষের সেদিনের অপেক্ষায় তাঁরা ছিলেন। ভোটে তাঁরা দেখিয়ে দিলেন এসব ব্যাপারে তাঁদের কোন সায় ছিলনা। জ্যোতিবাবুরা পুলিশ এবং অপুলিশনেতাদের অপকর্মের কথা ভালভাবেই জানতেন। কিন্তু জেনেশুনেও তাঁরা কোন ব্যবস্থা নেননি। ভোটের পর জ্যোতি বাবু লালবাজারের দুইজন পুলিশনেতাকে ডেকে ধমক দিয়ে বলেছেন। এসব কি হচ্ছে? আপনাদের চালচলন জনগণ ভাল চোখে নিচ্ছে না। দেখেশুনে কাজ করুন। পার্টির বদনাম করবেন না। পার্টি থেকে বার করে দেব।

কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। জ্যোতিবাবুর ঘুম বড় দেরিতে ভাঙল। এখন তো ভাঙা হাট।□

সংবাদ-সাহিত্য

এতদিনে দীনা হীনা পিঁচুটিনয়না বঙ্গ-সরস্বতীর দুঃখ সম্পূর্ণ ঘুচিয়া গেল। দৈনিকপত্রে প্রকাশিত এশিয়ান পেন্টসের শিরোমণি পুরস্কার -- সাহিত্য ও নাটকের জন্য একসঙ্গে একেবারে দশজন বীণাপাণির বরপুত্র-কন্যাকে পুরস্কৃত করার সংবাদে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। আরও সুখের কথা, প্রতি তিন মাস অন্তর এশিয়ান পেন্টস এইভাবে অন্তত: দশজনকে পুরস্কার দিয়া চলিবেন। সহযোগী এক সাপ্তাহিকের জানুয়ারির একটি সংখ্যায় শিরোমণি পুরস্কারের বিস্তৃত বিবরণ পাঠান্তে এই রচনা লিখিতেছি। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে সাহিত্যে সাগরময় ঘোষ হইতে শুরু করিয়া নীললোহিত পর্যন্ত মস্ত বড় বড় সাহিত্যিকেরা আছেন। সঙ্গে আদ্যাশক্তিস্বরূপা নবনীতা দেবসেন। নাটকে একাকিনী নাথবতী অনাথিনী [?] বৎ শাঁওলী মিত্র। বিবরণ পাঠে চমৎকৃত হইলাম নৃত্যশিল্পী অমলাশঙ্কর(অন্নদাশঙ্কর নহেন) উপস্থিত থাকিয়া সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে বাণী দিবার ছলে এইসব ভিক্ষু সাহিত্যিকের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয়, তবুও ইঁহাদের ধুতি শাড়ি পেন্টুলেন খসিয়া পড়ে নাই।

সাগরময় ঘোষ তাঁহার 'হীরের নাকছাবি'র জন্য এবং নীললোহিত 'ভালবাসা নাও, হারিয়ে যেওনা'র জন্য সুবোধ বালকের মত তিন হাজার টাকা ও তৎসহ খানিকটা 'copper material' হজম করিয়াছেন। আমরা কিন্তু এশিয়ান পেন্টসের নিষ্ঠুরতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। এই কোম্পানির রং যাহারা ব্যবহার করে, সেই জনসাধারণের কথা বাদ দিলেও বেশ কিছু সংখ্যক রংমিস্ত্রি এবং স্বল্পতর কনট্রাক্টর ঠিকাদারদেরই হক ছিল এশিয়ান পেন্টস কর্তৃক পুরস্কৃত হওয়ার। বহু কষ্ট সহ্য করিয়া অল্পমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জীবনের ঝুঁকি লইয়া রংমিস্ত্রিরা যে কাজ করিয়া থাকে, সামান্য কিছু পুরস্কার দিলে সেই প্রাপকদের উৎসাহ অনেক বৃদ্ধি পাইত। ফলে আখেরে লাভ হইত কোম্পানিরই। সেখানে অমলাশঙ্কর নাচিলেও আমরা আপত্তি করিতাম না।

সাপ্তাহিকটির পরবর্তী সংখ্যাতেই অসকার টি.ভি. প্রস্তুতকারক আয়োজিত মিস ক্যালকাটা কনটেস্ট পুরস্কার দানের বিষয়টি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। সেখানে পুরস্কৃত হইয়াছেন নীনা, রীণা এবং বেভারলি।

হীরের নাকছাবি ও ভালবাসা দেয়া-নেয়ার জন্য এশিয়ান পেন্টসের দুই কৃতকর্মা সাহিত্যিককে অসকার প্রতিযোগিতায় দেখিলে আমরা ডবল সুখী হইতাম। সাগরময় 'একই ব্লাউজে একদিকে হাতা অন্যদিকে স্লিভলেস' এবং নীললোহিত লোহিতবর্ণের 'প্যাডেল পুশার' পরিয়া নীনা রীণাদের সহিত কমপিটিশনে নামিলে শেষ পর্যন্ত কাহার জয় হইত বলা মুশকিল, তবে যুগোপযোগী হইত সন্দেহ নাই।

গ্র্যান্ড হোটেলের বলরুমটিকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করিতেছিলেন সেই জিমি আর্দেশর (সম্ভবত 'জিমিস কিচেনে'র মালিক) কিঞ্চিৎ 'লাগামহীন' হইয়া জনৈকা তরুণীকে একটি কঠিন প্রশ্ন করিয়া প্রায় ভরাডুবি ঘটাইয়াছিলেন -- 'কোনটা বেশি ভাল লাগে -- পোশাক খুলতে না পরতে?'

ঘোরতর রসের ব্যাপার, মনের মধ্যে রসিকতা করার লোভ উঁকি মারিতেছে, কিন্তু থাক। এইটুকু বলিতে পারি এ প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর দিতে পারিতেন সাগরময় ঘোষ নহেন, নীললোহিতের পরম বান্ধব চুল্লুলোহিত অর্থাৎ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

সাহিত্যিকদের লইয়া কারবার চলিতেছে সেইজন্যই আমরা পুরস্কারের ব্যাপারে মাথা ঘামাইতেছি। অন্য সাপ্তাহিকে ইহা যখন সংবাদ হইয়াছে তখন আমাদের সংবাদ-সাহিত্যে ইহাকে উপেক্ষা না করা উচিত -- অপ্রাসঙ্গিক অবশ্যই হইবে না।

* * *

জের টানিয়া আরও কিছু বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। বিউটি কনটেস্ট যেখানেই হউক না কেন, ফেয়ার সেক্সদের লইয়াই হয়। পুরুষের কি সৌন্দর্য নাই? অ্যানাটমির লাইনে -- রমণীদের কথা বলিব না, মরদের তো ট্রাইসেপ্স বাইসেপ্স থাইসেপ্স কোমর নিতম্ব ইত্যাদি অনেক কিছুই আছে। সেইগুলি সম্বল করিয়া পুরুষদের বিউটি কনটেস্টের আয়োজন অবিলম্বে শুরু করা দরকার। এই নারীপ্রগতির যুগে স্ত্রীলোকদের বঞ্চিত রাখা কেন?

জোয়ান মরদেরা নেংটি পরিয়া স্টেজে দাঁড়াইবেন, নানা অঙ্গভঙ্গিসহকারে থাই হইতে থাইরয়েড সবকিছু দর্শকদের সামনে তুলিয়া ধরিবেন। দর্শক অবশ্য চৌদ্দ আনা মহিলা হওয়া ন্যায়সঙ্গত। বিচারকও মহিলা হওয়া চাই। পুরুষেরা প্যারেড করিয়া যাইবেন, তরুণী, যুবতী ও মধ্যবয়স্কার দল শ্যাম্পেনে মুখ লাগাইয়া মুগ্ধনেত্রে তাহা পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে, ঠিক তালে হাততালি দিয়া উৎসাহিত করিবেন, পছন্দসই মরদকে মেডেল বা টাকার তোড়া দানে ধন্য করিবেন, তবেই তো সাম্য বজায় থাকে। তাহা না হইলে এই একতরফা কনটেস্ট আর কাঁহাতক বরদাস্ত করা যায়?

আশা করি অসকার এবং অন্যান্য সৌন্দর্য পুরস্কার-উদ্যোক্তারা এ বিষয়ে সচেতন হইবেন।

* * *

গোপালদা নালিশ জানাইয়াছেন, ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা ইচ্ছা করিয়া ইতিহাসের অমর্যাদা করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের এক একটা অধ্যায় -- আলেকজান্ডার অশোক সিদ্ধার্থ ইঁহারা রাষ্ট্র-রাজনীতির আসর হইতে একে একে হয় বিতাড়িত নয় উপেক্ষিত হইতেছেন। গোপালদার নিকট ইহা কেমন যেন গোলমেলে ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে, হিসাব মিলাইতে পারিতেছেন না। আমরাও চক্ষুকর্ণ সজাগ রাখিয়াছি। ◻

বিবাহযোগ্য পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়

তথ্যকেন্দ্র

১০, গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট (রাজভবনের সামনে) কলি-১ ফোনঃ ২৩-৪৪৬৭

সম্পাদিকা
মঞ্জুশ্রী তালুকদার এম.এ.
উপদেষ্টা
অরুণ চট্টোপাধ্যায়
এম. এসসি., পি এইচ. ডি.

তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে
বিবাহিত পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা

জুলাই ১৯৮২	৮৯৪
জুলাই ১৯৮৩	৯৪৮
জুলাই ১৯৮৪	৯৭২

নিয়মাবলী

১। তথ্যকেন্দ্রের নির্দিষ্ট ফর্মে পাত্র-পাত্রীর সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

২ তালিকাভুক্তির জন্য পাঁচ টাকা, সার্ভিস চার্জ মাসে দশ টাকা ও বিবাহ স্থির হলে ফাইনালাইজেশন ফি দশ টাকা অর্থাৎ প্রথম মাসে মোট পনের টাকা, পরের মাস থেকে দশ টাকা ও বিবাহ স্থির হলে দশ টাকা দিতে হবে।

৩। রেজিস্ট্রেশনের এক বৎসরের মধ্যে বিবাহ স্থির না হলে পরবর্তী এক বছর বিনা ব্যয়ে তথ্যকেন্দ্রের সার্ভিস পাবেন।

* বিশেষ ক্ষেত্রেExclusive Service এর ব্যবস্থা করা হয়

**পাত্র-পাত্রীর নির্বাচনের কাজ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ত্বরান্বিত করার Computer Service এর ব্যবস্থা আছে

কয়েকটি মতামত

"সদস্যের সংখ্যা প্রায় বাইশ হাজার । যন্ত্রজ্যোতিষী (Computer) এক মিনিটেরও কম সময়ে মনে মনে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কষে জানিয়ে দেবেন কোন্ পাত্রের উপযুক্ত কোন্ পাত্রী আর কোন্ পাত্রীর উচিত কোন্ পাত্রকে বরমাল্যে অভিষিক্ত করা।"

—আনন্দবাজার

The number of wedding under the agency's auspices since June 1972 encourages optimism. From 102 that month the figure has shot up to 408 last January. Bless the bride— and the agency"

—Statesman.

SANIBARER CHITHI □ VOL. 1.No. 16 □ 9 FEBRUARY 1985 □ Regn No. 42168/84 □ Rs. 2.00

CHALLENGE IN CONSTRUCTION

CENTRAL ENGINEERING SYNDICATE
(An Undertaking of New Central Group Engineering Pvt. Ltd.)

CENTRAL CONCRETE & ALLIED PRODUCTS (P) LTD
Registered Office—8, Camac Street,3rd floor, Calcutta-700 017
Gram CENTPILES,Telex CENT IN CA-021-2331
Phones 44-0090, 43-4262, 43-1521, 43-1554

WEST BENGAL DECLARATION NO. 202/84